🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

April to Octo2026- সম্পাদককে পত্র

সম্পাদককে পত্র (এপ্রিল-অক্টোবর ২০২৬)

এপ্রিল ২০২৬ থেকে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদককে পত্রের বিষয়গুলি ওয়েবসাইটে দেওয়া হলো। বিষয়গুলি সম্পূর্ণ আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও যুক্ত করা হবে। সেগুলিও পরীক্ষার আগেই ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।পরীক্ষার আগে সমস্ত বিষয় একসঙ্গে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি, পরীক্ষার আগে কোন কোন Topic বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, সেগুলিও আলাদাভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে। নিয়মিত আপডেট পেতে Follow করুন:

🌐 Website: www.banglabakaran.com

ওয়েবসাইটের লিঙ্কে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দেখে নাও।

✉ WBCS সম্পাদককে পত্র (Letter to the Editor)

Current Topics-এর সঠিক প্রস্তুতিই পারে তোমাকে এগিয়ে রাখতে!

WBCS Mains-এ সম্পাদককে পত্র লেখার ক্ষেত্রে Current Topics বা সমসাময়িক বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষায় কোন বিষয়টি আসবে, তা আগে থেকে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তাই শুধু পুরনো বিষয়ের ওপর নির্ভর না করে সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সম্পর্কে নিয়মিত জানতে হবে।

📌 কীভাবে প্রস্তুতি নেবে?

◇ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদককে পত্র পড়বে: গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির ওপর নজর দেবে। প্রয়োজনীয় তথ্য, যুক্তি ও বিশ্লেষণ সংগ্রহ করবে।

◇ হুবহু নকল নয়, নিজের ভাষায় লিখবে: সংবাদপত্র থেকে তথ্য ও বক্তব্য গ্রহণ করতে পারো। তবে পরীক্ষায় নিজের ভাষায়, সহজ-সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে লিখতে হবে। লেখার ধরন হবে সম্পূর্ণ পরীক্ষাভিত্তিক।

◇ আমাদের Model Answer অনুসরণ করবে: তোমাদের প্রস্তুতির সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ Current Topics নির্বাচন করে সম্পাদককে পত্রের ওপর পরীক্ষাভিত্তিক Model Answer তৈরি করা হয়েছে।

★ কেন আমাদের Model Answer সংগ্রহ করবে?

শুধু সংবাদপত্র পড়লেই পরীক্ষার উপযোগী চিঠি তৈরি করা সম্ভব নয়। সংবাদপত্রে অনেক তথ্য ও বিশ্লেষণ থাকে, কিন্তু সেগুলিকে WBCS-এর নির্দিষ্ট প্রশ্নের ধরন, শব্দসীমা ও পরীক্ষার উপযোগী কাঠামোয় সাজানো একটি বিশেষ দক্ষতার বিষয়।

সেই কাজটিই সহজ করে দিতে আমাদের Model Answer-গুলি তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিটি Model Answer-এ থাকছে–

- গুরুত্বপূর্ণ ও নির্বাচিত সমসাময়িক বিষয়।
- প্রয়োজনীয় তথ্য ও যুক্তির সঠিক ব্যবহার।
- পরীক্ষার উপযোগী ভাষা ও শব্দচয়ন।
- নির্দিষ্ট শব্দসীমার মধ্যে সম্পূর্ণ চিঠি।
- আকর্ষণীয় সূচনা ও কার্যকর উপসংহার।

🔔 নিজে প্রতিটি বিষয়ের তথ্য খুঁজে, যাচাই করে এবং চিঠি তৈরি করতে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে না। আমাদের প্রস্তুত Model Answer পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা তৈরি করো, লেখার কৌশল শেখো এবং নিজের ভাষায় লেখার অভ্যাস গড়ে তোলো।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদক সমীপেষু: প্রাজ্ঞ ও দিগ্‌দর্শী

---------বিশিষ্ট ভাবে বাঙালি ও ভারতীয় এই মনীষীর ধ্যানজ্ঞান ছিল নিজের দেশ, সংস্কৃতি ও মানুষকে কেন্দ্র করে। আজ যখন আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যসাধনার অগ্রগতি নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে, তখন সদ্য অতিক্রান্ত ১২৫তম জন্মবর্ষে সুকুমার সেনকে আরও বেশি মনে রাখা প্রয়োজন।-----

‘পুরোধা’ (কলকাতার কড়চা, ২১-২) বিষয়ে কিছু কথা। তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুকুমার সেনের ভাষার ইতিবৃত্ত ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বাংলায় লেখা প্রামাণ্য পুস্তক। বাংলা ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও বিশ্লেষণের উপর এতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রাচীন ও মধ্যকালীন আর্যভাষায় লিখিত ভারতীয় সাহিত্যের একটি প্রামাণ্য ইতিহাসও রচনা করেন। তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক, ইতিহাসকার, আবার ভারতবিদ্যার সাধকও।

তাঁর আর এক অন্যতম কীর্তি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পাঁচ খণ্ড) রচনা। সযত্নে পরীক্ষিত পুঁথিপাঠের ভিত্তিতে রচিত এই গ্রন্থ সাহিত্যের এক যুক্তিনির্ভর ইতিহাস। তথ্যের বিপুলতায় সমৃদ্ধ এই আকরগ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে বাংলা-ভাষাভাষী মানুষের সামগ্রিক ইতিহাস। যা পড়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রীত হয়ে বলেছিলেন, “বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র ইতিপূর্বে আমি পড়িনি। গ্রন্থকার তাঁর বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত পুস্তকগুলি থেকে যে দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তাতে করে তাঁর গ্রন্থ এক সঙ্গে ইতিহাসে এবং সঙ্কলনে সম্পূর্ণরূপ ধরেছে... এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত হওয়াতে রচনার মূল্যবৃদ্ধি করেছে।”

পরিকল্পনা ও রচনারীতির দিক দিয়েও সুকুমার সেনের এই গ্রন্থ আলাদা ছিল। এখানে প্রতিটি যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও তার অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে তিনি পাঠকবর্গের পরিচয় করিয়েছেন। এ ছাড়া চর্যাগীতি-সহ একাধিক বিষয়ের আলোচনাকালে তিনি মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অনন্যতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, “সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের মানদণ্ডে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ মহাকাব্য।”

তাঁর চৈতন্যচর্চাও ছিল বিশদ, গভীর এবং যথেষ্ট ঋদ্ধ। তিনিই প্রথম পুঁথিনির্ভর তথ্য-প্রমাণ সহযোগে উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্য নিয়ে আলোচনা করেন। কৃষ্ণরাম দাসের মঙ্গলকাব্য নিয়েও তিনি প্রথম সবিস্তারে আলোচনা করেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, “ধর্মঠাকুর বৈদিক সূর্য দেবতা। ইনি শ্বেত-অশ্বারোহী (ধবল-খচর) সিপাহী বেশধারী (ঈরাণীয়) সূর্যও বটেন।” আবার ময়মনসিংহ পূর্ববঙ্গ-গীতিকার পালাগুলির প্রামাণিকতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, পালাগুলি সর্বাংশে অকৃত্রিম নয়। সুকুমার সেনের আ হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটারেচার একটি অসাধারণ কাজ। ব্রজবুলি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এমন দিগ্‌দর্শী আলোচনা তাঁর আগে কেউ করেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রায় পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদকর্তার পরিচয় উদ্ধার করেছেন। সুকুমার সেন ছিলেন রামকথার বহুত্ববাদে বিশ্বাসী। লিখেছিলেন রামকথার প্রাক্-ইতিহাস নামে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। তাঁর গবেষণাকর্ম বঙ্গসংস্কৃতির সীমা ছাড়িয়ে বহু দূর বিস্তৃত ছিল।

বিশিষ্ট ভাবে বাঙালি ও ভারতীয় এই মনীষীর ধ্যানজ্ঞান ছিল নিজের দেশ, সংস্কৃতি ও মানুষকে কেন্দ্র করে। আজ যখন আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যসাধনার অগ্রগতি নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে, তখন সদ্য অতিক্রান্ত ১২৫তম জন্মবর্ষে সুকুমার সেনকে আরও বেশি মনে রাখা প্রয়োজন।

Facebook Page: WBCS Bengali Compulsory Paper | 18,000+ Followers | By Pathak Sir for Study meterial

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদক সমীপেষু: মানবিক সিদ্ধান্ত

দীর্ঘদিন কোমায় থাকা এক রোগীর ক্ষেত্রে জীবনদায়ী ও সহায়ক চিকিৎসা প্রত্যাহারের অনুমতি দিয়ে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চিকিৎসকদের মতে বাস্তবিকই হরিশ রানার সুস্থ হয়ে ওঠার আর কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে আদালতের নির্দেশমতো ‘প্যাসিভ ইউথানেসিয়া’ বা জীবনরক্ষাকারী কৃত্রিম ব্যবস্থা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া কার্যকর হয়েছে, যা দেশে ‘মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুর অধিকার’ নিয়ে নতুন করে ভাবনার অবকাশ সৃষ্টি করেছে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আজ বহু ক্ষেত্রে মানুষের জীবন কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘদিন ধরে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু যখন চিকিৎসা আর আরোগ্যের কোনও সম্ভাবনা দেখায় না, তখন সেই জীবনকে যন্ত্রের সাহায্যে অনির্দিষ্ট কাল ধরে টেনে নেওয়া কতটা মানবিক— এই প্রশ্নই ক্রমশ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতে এই বিতর্ক জোরদার হয় অরুণা শানবাগের মামলার রায়ের মাধ্যমে, যখন সুপ্রিম কোর্ট প্রথম বার সীমিত শর্তে ‘প্যাসিভ ইউথানেসিয়া’-র স্বীকৃতি দেয়। পরে আদালত স্পষ্ট ভাবে জানায় যে মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার অধিকারও সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের জীবনের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, জীবন যেমন মূল্যবান, তেমনই জীবনের শেষ মুহূর্তেও মানুষের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার অধিকার সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেই রায়ে আগাম ইচ্ছাপত্রের ধারণাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যাতে এক জন ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় ভবিষ্যতের চিকিৎসা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশ করে যেতে পারেন।

হরিশ রানার শেষের দিনগুলি প্রমাণ করল, এ ধরনের সিদ্ধান্ত কোনও ভাবেই সহজ নয়। মৃত্যু জীবনেরই এক অনিবার্য সত্য। সেই সত্যকে স্বীকার করে যদি কোনও অসহায় মানুষকে অন্তহীন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া যায় এবং পরিবারের দীর্ঘ বেদনাকেও কিছুটা লাঘব করা যায়, তবে তা মানবিকতা, সহমর্মিতা ও মর্যাদাবোধের এক পরিণত সামাজিক উপলব্ধি।

Facebook Page: WBCS Bengali Compulsory Paper | 18,000+ Followers | By Pathak Sir **for Study meterial**

সম্পাদক সমীপেষু: দুর্নীতির চাকায়

আসলে হাসপাতাল যদি কোটি কোটি টাকা উপার্জনের আস্তানা হয়ে ওঠে এবং প্রশাসন নিস্পন্দ থাকে, তবে স্বাস্থ্য পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়বেই। আর জি করের ঘটনার নিষ্পত্তি হল না এখনও।

সোমা মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘সব থাকা সত্ত্বেও নিঃস্ব’ (১০-৩) প্রবন্ধ পড়েই এই চিঠি লেখার প্রয়াস। রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই স্বাস্থ্যের খোলনলচে কিছুটা পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, জনসাধারণের কাছেও তেমনই বার্তা গিয়েছিল। সময়-অসময়ে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে হঠাৎ করে ঢুকে পড়া এবং সেখানকার হালচাল বোঝার একটি প্রয়াস তাঁর ছিল, সন্দেহ নেই। আউটডোর ঠিক সময়ে খোলা, ডাক্তারদের সময়মতো হাসপাতালে হাজিরা— এ সবই মানুষ দেখেছিল। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির যে বিরাট হেরফের হয়ে যাবে— অচিরেই মানুষের সেই ভুল ভাঙতে শুরু করে। একটির পর একটি জেলায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হলেও পরিষেবা দেওয়ার মতো পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে কি? আগে জেলায় যাঁদের পোস্টিং ছিল, তাঁরা কলকাতার বাসিন্দা হলেও সপ্তাহে অন্তত তিন-চার দিন জেলায় তাঁদের দেখা যেত। এখন ওই সব জায়গায় তাঁদের হাজিরা শুধু কাগজে-কলমে। জেলা হাসপাতালে কোটি কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি কেনা হলেও সেগুলি চালানোর লোক নেই; ফলে অপব্যবহারে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আসলে হাসপাতাল যদি কোটি কোটি টাকা উপার্জনের আস্তানা হয়ে ওঠে এবং প্রশাসন নিস্পন্দ থাকে, তবে স্বাস্থ্য পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়বেই। আর জি করের ঘটনার নিষ্পত্তি হল না এখনও।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গরিব মানুষের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক পদক্ষেপ, এ কথা মানতেই হবে। এর ফলে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালের দরজাও গরিব মানুষের জন্য খুলেছে। কিন্তু এই স্বাস্থ্যসাথীকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে নতুন দুর্নীতির চক্র। যে অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসা সরকারি হাসপাতালে সম্ভব, তার জন্যও রোগীদের বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। জেলায় জেলায় ছোট ছোট নার্সিংহোম গজিয়ে উঠেছে মূলত স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের উপর নির্ভর করে।

যে পরিমাণ অর্থ গরিব মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে খরচ হচ্ছে, সেই অর্থ দিয়ে যদি সরকারি হাসপাতালগুলির প্রয়োজনীয় উন্নয়ন করা যেত, সেটাই হত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত। আসলে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ যখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়, তখন তা হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী। এই চক্র এক বার শুরু হলে তাকে বাগে আনা সহজ নয়। আর জি কর আন্দোলনের সময় হয়তো এই দুর্নীতির লাগাম সাময়িক ভাবে টানা গিয়েছিল, কিন্তু তা থামেনি। শিক্ষার পর স্বাস্থ্যে যে সীমাহীন দুর্নীতির কবলে আজ এই রাজ্য, তার থেকে পরিত্রাণের পথ সহজ হবে বলে মনে হয় না।

Facebook Page: WBCS Bengali Compulsory Paper | 18,000+ Followers | By Pathak Sir **for Study meterial**

সম্পাদক সমীপেষু: বিকল্প পরিবহণ

ট্রামের নিজস্ব লাইন আছে, তার উপর যদি মালপত্র রাখা হয়, গাড়ি পার্কিং হয়, ট্রামের গতি রুদ্ধ হতে বাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রামের বিদায় ঘণ্টা অনেক দিন আগেই বাজিয়ে দিয়েছে। ট্রামের বিপক্ষে অনেক যুক্তি। আর্থিক ক্ষতি, গতি কম, রাস্তায় যানজট তৈরি করে, ট্রামলাইনে দু'চাকাধারীরা স্কিড করে যান ইত্যাদি। এর মধ্যে ট্রাম ডিপোর জমি বিক্রির কথাবার্তা হয়ে গেছে। দু'টি রুটে অনিয়মিত ট্রাম চলছে, বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জ রুট অকারণে বন্ধ রাখা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন তোলা যায়, ট্রামের কারণে যানজট হলে হাওড়া-শিবপুর বা বাঁধা ঘাটের ট্রাম তুলে দেওয়ার পরও যানজট এত বাড়ল কী করে? ট্রামের নিজস্ব লাইন আছে, তার উপর যদি মালপত্র রাখা হয়, গাড়ি পার্কিং হয়, ট্রামের গতি রুদ্ধ হতে বাধ্য। তবে ট্রামকে হেরিটেজ তকমা লাগিয়ে স্যালাইন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ইউরোপ বা অন্য দেশের মতো আধুনিক গতিময় ট্রাম দরকার। সেখানে একই রাস্তায় ট্রাম, বাস, সাইকেল দিব্যি চলছে। কিন্তু এ রাজ্যে তার জন্য যে টাকা বিনিয়োগ করতে হবে, তা কোনও সরকারই দিতে আগ্রহী নয়। কারণ, এই বিনিয়োগ কোনও ভাবে ভোট কেনার কাজে লাগবে না।

কিছু দিন আগের একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। গোয়া এয়ারপোর্টে বসে ছিলাম কলকাতা ফ্লাইটের জন্য। এক জন সুইডিশ ভদ্রমহিলাও যাত্রী ছিলেন। তাঁর এক জন বন্ধু চেন্নাই থেকে কলকাতা আসবেন। দু'জনে তিন-চার দিন কলকাতা ঘুরে বেঙ্গালুরু হয়ে দেশে ফিরবেন। তিনি আমার কাছে কলকাতা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলেন এবং তাঁর ওয়টস্যাপে লিখে পাঠাতে বললেন। পরে কলকাতার ট্রামে চড়া সম্ভব কি না জানতে চাইলে আমি তাঁকে এসপ্ল্যানেড ডিপোতে যেতে বলেছিলাম। কারণ, শুধু ওখান থেকেই দু'টি রুটের ট্রাম চলে। কলকাতা থেকে যাওয়ার সময় ট্রাম নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস ও কিছু ট্রামের ছবি-সহ মেসেজ পেয়ে মনে হল ট্রামকে রাখার জন্য আমরা কেন সব রকম চেষ্টা করব না?

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদক সমীপেষু: নতুন এক দিগন্ত

এই প্রযুক্তির দৃশ্যমান চেহারার আড়ালে যে মৌলিক শক্তি কাজ করে, তা হল গণিত। প্রশ্নটা স্বাভাবিক— ভবিষ্যতে কি এআই গণিতকে অপ্রয়োজনীয় করে দেবে? বাস্তবে ডিপ লার্নিং, গ্রাফ নিউরাল নেটওয়ার্ক কিংবা কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং— সব ক্ষেত্রেই নতুন গাণিতিক তত্ত্ব তৈরি হচ্ছে।

বিশ্বদীপ সেনশর্মার ‘এআই আর কল্পনার ভবিষ্যৎ’ (২০-২) প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথার সংযোজন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জীবনে ঝড়ের মতো নয়, বরং বাতাসের এক সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মতো প্রবেশ করেছে। এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবন, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ইত্যাদির সচেতনতা ও পরিষেবার বাইরেও বহু কার্যপদ্ধতি পরিচালনা করে। এর সব কিছুর পিছনেই কাজ করে মেশিন লার্নিং।

এই প্রযুক্তির দৃশ্যমান চেহারার আড়ালে যে মৌলিক শক্তি কাজ করে, তা হল গণিত। প্রশ্নটা স্বাভাবিক— ভবিষ্যতে কি এআই গণিতকে অপ্রয়োজনীয় করে দেবে? বাস্তবে ডিপ লার্নিং, গ্রাফ নিউরাল নেটওয়ার্ক কিংবা কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং— সব ক্ষেত্রেই নতুন গাণিতিক তত্ত্ব তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ, এআই গণিতকে প্রতিস্থাপন করছে না, বরং গণিতের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। গণিত ও এআই-এর সম্পর্ক একমুখী নয়, পারস্পরিক। তবুও, এই নীরব বিপ্লবের আড়ালে লুকিয়ে আছে এমন একটি প্রশ্ন— এআই কি মস্তিষ্ক ও মানবতাকে পরাভূত করবে, না কি মস্তিষ্ক ও মানবতা প্রজ্ঞা দিয়ে এআই-কে পরিচালনা করতে শিখবে? মানুষের চেয়ে দ্রুত গতিতে যে সমস্যা সমাধান করে, সে কি মানুষের চিন্তাকেও অপ্রয়োজনীয় করে দেবে?

ধরুন, নেমেছেন এক অজানা স্টেশনে। বসেছেন রিকশায়। দিয়েছেন ঠিকানা। রিকশাওয়ালা কিন্তু গুগল ম্যাপের মতো বিশাল ডেটা ব্যবহার করেন না। তাঁর মস্তিষ্কে সংরক্ষিত মানচিত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু ক্যাবের এআই সার্ভারকে প্রতি বার যাত্রাপথ বার করতে হয় বিশাল তথ্যভান্ডার থেকে হিসাব কষে।

আবার ধরুন, বাংলা ব্যাকরণ শিখে আপনি যে কোনও বিষয়েই বাংলা প্রবন্ধ লিখতে পারবেন। এমনকি ইংরেজি প্রবন্ধও লিখতে পারবেন— শুধু ইংরেজি ব্যাকরণ শিখে নিয়ে এবং কিছু শব্দভান্ডার আয়ত্ত করলেই। এআই মানুষের চেয়ে দ্রুত গতিতে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে, নিখুঁত ভাবে বিশাল ডেটা মনে রাখতে পারে, একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ‘জেনারেটর’। কিন্তু সমস্যা শুরু হয়, যখন তাকে একের পর এক নতুন কাজ শেখাতে হয়; তখন পুরনো কাজের জন্য ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক বদলে যায় অথবা নষ্ট হয়ে যায়।

মস্তিষ্ক এবং বর্তমান এআই— বুদ্ধিমত্তার দুই আলাদা প্রজাতি। একটি অন্যটির উন্নততর সংস্করণ নয়; বরং একে অন্যের পরিপূরক। এআই মানুষের ভূমিকাকে হ্রাস করে না, বরং তাকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে।

Facebook Page: WBCS Bengali Compulsory Paper | 18,000+ Followers | By Pathak Sir for Study meterial

সম্পাদক সমীপেষু: খাবার অপচয়

২০২২ সালের রাষ্ট্রপুঞ্জের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও)-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে উৎপাদিত ফসলের প্রায় ৪০ শতাংশ গ্রাহকের হাতে পৌঁছনোর আগেই নষ্ট হয়। বিশ্ব ক্ষুধা সূচক ২০২৫ অনুযায়ী, ১২৩টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০২তম, যা সূচক অনুযায়ী উদ্বেগজনক।

শিয়ালদহ-সহ দেশের বিভিন্ন জংশন চত্বরের চিরপরিচিত ব্যস্ততার আড়ালে প্রতি দিন নিঃশব্দে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক অপচয়, যা আমরা অনেক সময় দেখেও দেখি না। লরি বা ট্রেন থেকে ফল বা খাদ্যসামগ্রী স্থানান্তরের সময়ে সামান্য অসাবধানতায় থেঁতলে যাওয়া তরমুজ, পেঁপে বা অন্যান্য ফলমূল চিরাচরিত বাণিজ্যিক নিয়মে আজও ব্রাত্য। অথচ, এই ‘বিশ্রী’ ফলগুলোই হতে পারত কোনও অভুক্ত শিশু বা অনাথের বেঁচে থাকার প্রধান রসদ। রাস্তার ধুলোবালিতে পড়ে থাকা ফলটির সামান্য লাল অংশ কোনও পথশিশুর খুঁটে খাওয়ার করুণ দৃশ্য আজও আধুনিক ভোগবাদী সভ্যতার নিষ্ঠুরতা ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানসিকতাকেই প্রকট করে।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

২০২২ সালের রাষ্ট্রপুঞ্জের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও)-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে উৎপাদিত ফসলের প্রায় ৪০ শতাংশ গ্রাহকের হাতে পৌঁছনোর আগেই নষ্ট হয়। বিশ্ব ক্ষুধা সূচক ২০২৫ অনুযায়ী, ১২৩টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০২তম, যা সূচক অনুযায়ী উদ্বেগজনক। এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতির দিনে এমন অপচয় আমাদের খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নীতিগত এবং পরিকাঠামোগত খামতির প্রতীক। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাত্র এক কেজি তরমুজ ফলাতে প্রায় দু'শো-তিনশো লিটার পরিস্রুত জল, রাসায়নিক সার ও কৃষকের অমানুষিক শ্রম ব্যয় হয়। ফল নষ্ট হওয়া মানে প্রকারান্তরে কৃষকের ঘাম ও সীমিত জলসম্পদের অপমৃত্যু।

এই অপচয় রোধে সরকারি উদ্যোগে বা 'ফুড ব্যাঙ্ক'-এর মাধ্যমে একটি সুসংগঠিত শৃঙ্খল গড়ে তোলা জরুরি। এই সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত ফলগুলো সংগ্রহ করে যদি 'পথের ক্যান্টিন' বা অনাথ আশ্রমে পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে প্রান্তিক শিশুরা প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজের জোগান পাবে। মনে রাখা প্রয়োজন, অপচয় হওয়া প্রতিটি ফল মানে কেবল একটি খাদ্যের নষ্ট হওয়া নয়, বরং একটি ক্ষুধার্ত মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া। এই ফলগুলি বিষ নয়, কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের অভাবে বর্জিত। সঠিক বণ্টন ও প্রশাসনিক সদিচ্ছাই পারে এই অপচয় রুখে ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে। অন্যথায়, প্ল্যাটফর্মের ধুলোয় লুটানো এই ফলগুলি আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সামগ্রিক ব্যর্থতা ও বিবেকের পচনকেই বার বার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে।

সম্পাদক সমীপেষু: হিংসা নয়, সৌহার্দ

ফলাফল ঘোষণার পর কোনও দল বা জোটের জয়লাভ এবং সরকার গঠন একটি প্রত্যাশিত পরিণতি। জয়ের আনন্দ উদ্‌যাপনও মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাভাবিক।

গণতন্ত্রের মূল সৌন্দর্য তার অংশগ্রহণমূলক চরিত্রে। এই ব্যবস্থায় জনগণই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, আর সেই ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে নির্বাচনের মাধ্যমে। তাই নির্বাচনকে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব বলা হয়— একটি এমন উৎসব যেখানে মত, পথ ও আদর্শের প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু লক্ষ্য থাকে জনকল্যাণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি নিয়ে জনগণের দরবারে হাজির হয়, মানুষ বিচার-বিবেচনা করে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই প্রক্রিয়াই গণতন্ত্রকে জীবন্ত ও গতিশীল রাখে।

ফলাফল ঘোষণার পর কোনও দল বা জোটের জয়লাভ এবং সরকার গঠন একটি প্রত্যাশিত পরিণতি। জয়ের আনন্দ উদ্‌যাপনও মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাভাবিক। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এই জয়ে, তাই উচ্ছ্বাস, আনন্দ— সবই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু এই আনন্দ যদি হিংসা ও প্রতিহিংসা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তবে তা গণতন্ত্রের মূল চেতনাকেই আঘাত করে।

এ বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে দীর্ঘ ১৫ বছর পর একটি রাজনৈতিক দলের পরাজয় এবং নতুন একটি দলের উত্থান এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। এই পরিবর্তন গণতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে— জনগণের রায়ই এখানে চূড়ান্ত। তাই এই ফলাফলকে সম্মান জানানো, মেনে নেওয়া এবং নতুন সরকারকে কাজ করার সুযোগ দেওয়াই গণতান্ত্রিক পরিপক্কতার পরিচয়।

এই প্রেক্ষাপটে সকল রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের প্রতি বিনীত আহ্বান— বাংলার সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অটুট রেখে আনন্দ উদ্‌যাপন করুন। বাংলার মাটি বরাবরই সহনশীলতা, সৌহার্দ ও মানবিকতার বার্তা বহন করে এসেছে। নির্বাচনোত্তর সময়ে সেই ঐতিহ্য যেন কোনও ভাবেই কলঙ্কিত না হয়। হিংসা কখনওই সমস্যার সমাধান নয়, বরং তা নতুন করে বিভাজন সৃষ্টি করে, সামাজিক বন্ধনকে দুর্বল করে।

উৎসব হোক সবার, আনন্দ হোক সর্বজনীন। জয়-পরাজয় গণতন্ত্রের অঙ্গ, কিন্তু মানবিকতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন তার ভিত্তি। তাই, সকলে মিলে এমন এক পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে রাজনৈতিক ভিন্নমত থাকলেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা অটুট থাকে। ভবিষ্যতের উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যাই আমরা সবাই এক সঙ্গে। নতুন সরকার গড়তে চলেছে। আগামী দিনগুলি যেন আর রক্তে রঞ্জিত না হয়। শুধু হাসি, আশা আর নতুন স্বপ্ন থাকুক প্রতিটি মুখে।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদক সমীপেষু: দুর্ভোগের পথ চলা

শহরের বিভিন্ন রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে সেগুলিকে দীর্ঘ দিন ধরে ও ভাবেই ফেলে রাখা এখন একটা ব্যাধিতে পরিণত। এতে শুধু যানচলাচলই নয়, সাধারণ মানুষেরও যাতায়াতে সমস্যা হয়। এখন রোড ট্যাক্স কোনও ভাবেই ফাঁকি দেওয়া যায় না। কারণ রোড ট্যাক্স না দিলে দূষণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র মেলে না।

‘উন্নয়নের অগ্নিমূল্য’ (৯-৪) শীর্ষক সম্পাদকীয়তে কলকাতা শহরের রাস্তা ও ফুটপাতগুলির বেহাল অবস্থা যথার্থ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একটা শহর প্রধানত সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে সেই শহরের রাস্তা ও ফুটপাতের সময়মতো সংস্কার ও পরিচ্ছন্নতার কারণে। কিন্তু সব সময়েই আমরা দেখি উল্টো ছবি। বর্ষাকালে শহরের রাস্তায় জল জমে যায় নিকাশি ব্যবস্থার ঠিকমতো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। যদিও এই সমস্যা অন্যান্য রাজ্যের বড় বড় শহরেও রয়েছে। পাশাপাশি, শহরের অধিকাংশ রাস্তাই অসমান। বহু জায়গা খানাখন্দে ভরা। এই খানাখন্দগুলিই যখন দায়সারা ভাবে পিচ দিয়ে তাপ্পি মারা হয়, তখনই অসমান হয়ে যায় রাস্তাগুলি। বিশেষত বাইপাসের রাস্তা, যেগুলি এক সময় শহরের গর্ব ছিল, আজ তারও একই হাল।

সেই সঙ্গে শহরের বিভিন্ন রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে সেগুলিকে দীর্ঘ দিন ধরে ও ভাবেই ফেলে রাখা এখন একটা ব্যাধিতে পরিণত। এতে শুধু যানচলাচলই নয়, সাধারণ মানুষেরও যাতায়াতে সমস্যা হয়। এখন রোড ট্যাক্স কোনও ভাবেই ফাঁকি দেওয়া যায় না। কারণ রোড ট্যাক্স না দিলে দূষণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র মেলে না। অথচ, সঠিক চেকিংয়ের অভাবেও বহু রোড ট্যাক্স অনাদায়ি থেকে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এ রাজ্যে যে পরিমাণ রোড ট্যাক্স আদায় হয়, সে অর্থেও যথেষ্ট কাজ হয় না বললেই চলে।

অন্য দিকে, শহরের ফুটপাতের অবস্থাও তথৈবচ। অধিকাংশ ফুটপাতই প্রশাসনের ও স্থানীয় দাদাদের সহযোগিতায় হকারদের কবলে। ফুটপাতের উপর তাঁদের জিনিসপত্র এমন ভাবে রাখা থাকে যে, সেগুলি থেকে দূরে থাকতে অনেক সময় পাশের পথচারীর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে চলতে হয়। অনেকে ভিড় এড়াতে তাই গাড়ির রাস্তায় নেমে পড়েন, যা কম ঝুঁকির নয়। আর পুজোপার্বণ এলে তো ফুটপাত দিয়ে চলাই সমস্যা হয়ে যায়। তা ছাড়া অধিকাংশ এলাকাতে ফুটপাতে দোকানগুলি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তৈরি। এখানে অনেক জায়গাতেই সঠিক অগ্নিনির্বাপণ বা নিরাপত্তাব্যবস্থা ছাড়াই দাহ্য বস্তুও রাখা হয়। ফলে কোনও কারণে আগুন লাগলে দোকানগুলি তো বটেই, পথচলতি মানুষদেরও কী হাল হতে পারে, সহজে অনুমেয়।

রাস্তা ও ফুটপাতের অবস্থা ঠিকমতো আছে কি না, দেখার দায় প্রশাসনের। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে সেই দায় তাঁরা নিতে আগ্রহী নন। ফলে ভোগেন সাধারণ মানুষ। অথচ, নির্বাচন এলেই রাস্তা বা ফুটপাত সারাইয়ের ধুম পড়ে। কেন? এই বিচিত্র মনোভাবের আশু পরিবর্তন জরুরি। না হলে মানুষের ভোগান্তি বাড়বে বই কমবে না।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

অতিরিক্ত নয়

আজকের সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিনিয়ত চোখে পড়ছে— সন্তানকে ভাল ভাবে মানুষ করার চেষ্টায় অনেক অভিভাবক অজানতেই তাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে ফেলছেন। ভালবাসা ও দায়িত্বের সীমা অতিক্রম করে যখন সব চাওয়া-পাওয়া পূরণ করা হয়, তখন তা সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য আশীর্বাদ নয়, বরং বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময়। বর্তমান সময়ের অনেক অভিভাবক নিজেরা কঠোর পরিশ্রম করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই সংগ্রামের মূল্যবোধটি সন্তানদের শেখাতে ভুলে যাচ্ছেন। তাঁরা মনে করেন, সন্তান যেন কোনও কষ্ট না পায়। তাই ছোটখাটো চাহিদা থেকে শুরু করে অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতাও সহজেই মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু এই অভ্যাস ধীরে ধীরে সন্তানের চরিত্র ও মানসিকতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

আরও উদ্বেগের বিষয় হল— অনেক ক্ষেত্রে সন্তান ভুল করলেও অভিভাবকেরা সেই ভুলকে সমর্থন করেন। শাসন বা সংশোধনের পরিবর্তে সন্তানের পক্ষ নেওয়াকে তাঁরা ভালবাসার প্রকাশ মনে করেন। অথচ, এতে সন্তানের মধ্যে ঠিক-ভুল বিচার করার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সে অজানতেই ভুল পথের দিকে এগিয়ে যায়। অকারণে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয়তো মুহূর্তের আনন্দ দেয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা সন্তানের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলতে পারে। সন্তানকে অযথা সব কিছু দেওয়ার নামই ভালবাসা নয়। বরং তাকে সুশিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দেওয়া বেশি জরুরি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলাসিতা নয়, কেবল প্রয়োজনীয় জিনিসই দিন। কারণ এক জন সুশিক্ষিত ও মার্জিত সন্তান শুধু পরিবারের নয়, সমাজ ও দেশের জন্যও মূল্যবান সম্পদ। এক দিন অভিভাবকেরাই উপলব্ধি করবেন— এক জন ভাল মানুষ গড়ে তোলা পৃথিবীর জন্য যেমন লাভ, তেমনই নিজেরও সবচেয়ে বড় সাফল্য।

Facebook Page: WBCS Bengali Compulsory Paper | 18,000+ Followers | By Pathak Sir for Study meterial

সম্পাদক সমীপেষু: অনিশ্চিত জীবন

অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী। এঁদের মূল জীবিকা মাছ ও কাঁকড়া ধরা। অনেকেই আবার নির্দিষ্ট মরসুমে মধু সংগ্রহে যান। কিন্তু তার সময়সীমা দু'-তিন মাস। কৃষিকাজ এখানে খুব একটা আকর্ষণীয় নয়। তার কারণ, লবণাক্ত জল, ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যার প্রাবল্য।

পবিত্র মণ্ডলের 'বন অধিকারহীন সুন্দরবন' (৩১-৩) সম্পর্কে কিছু কথা। সুন্দরবনের মূল বৈশিষ্ট্য এখানকার বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদ। এই ব-দ্বীপটির দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে এবং এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিস্তৃত। বর্তমানে সুন্দরবনে ১০২টি দ্বীপ আছে। তাদের মধ্যে ৪৮টিতে মানুষের বসবাস। মূল অরণ্যে যেখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থাকে, সেটি মোটামুটি সুরক্ষিত এবং এটি সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ (এসটিআর)-এর অধীন। এই অঞ্চলে সুন্দরবনবাসীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। পশ্চিমবঙ্গ বন দফতর বা এসটিআর-এর অনুমতি বিনা এই অরণ্য অঞ্চলে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী। এঁদের মূল জীবিকা মাছ ও কাঁকড়া ধরা। অনেকেই আবার নির্দিষ্ট মরসুমে মধু সংগ্রহে যান। কিন্তু তার সময়সীমা দু'-তিন মাস। কৃষিকাজ এখানে খুব একটা আকর্ষণীয় নয়। তার কারণ, লবণাক্ত জল, ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যার প্রাবল্য। এই মাছ, কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহের জন্য এঁদের পশ্চিমবঙ্গ বন দফতর কিংবা সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র নিতে হয়। প্রতি বছর মাছ, কাঁকড়া এবং মধু সংগ্রহকারীদের মধ্যে কেউ না কেউ বাঘের

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

শিকার হন। এঁদের মধ্যে যাঁরা অনুমতি না নিয়ে গিয়ে বাঘের শিকার হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের পক্ষে সরকারি সাহায্য পাওয়াও দুষ্কর হয়ে ওঠে।

এখানে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। অনুমতিপত্র দেওয়ার সময় শর্ত থাকে— একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং দলবদ্ধ অবস্থায় জঙ্গলে যেতে হবে। ওই সময় বনরক্ষী বাহিনী এঁদের সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত থাকে। তারা বনের বেশি গভীরে যেতে অনুমতি দেয় না। তা ছাড়া, বাঘের চলাফেরার রাস্তা ম্যাপিং ও বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে বন দফতর এই মানুষদের সতর্কও করে দেয়। যদিও বেশি মাছ, কাঁকড়া পাওয়ার আশায় অনেকেই একা একা ভোরবেলা বা বিকেলে, সন্ধ্যার মুখে মাছ-কাঁকড়া ধরতে বেরিয়ে যান। এর ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধকার বর্ণিত বন অধিকার শেষ পর্যন্ত বনবাসীদের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবে না তো? তবে বিএলসি আর নতুন করে বণ্টন করা হয় না। বংশ পরম্পরায় বিএলসি অধিকারীরা বিএলসি পেয়ে থাকেন। দেখা গেছে, বিএলসি প্রাপকরা আদৌ এই সব কাজে আর নিযুক্ত নন। যাঁরা যুক্ত, তাঁদের বিএলসি জোটে না। অনুমতিপত্রের জন্য তাঁদের কুড়ি থেকে ষাট হাজার টাকা দিতে হয়। ফলে আয়ের অনেকটাই চলে যায় এই খাতে।

সর্বোপরি, এই সব জীবিকা আর তেমন আকর্ষণীয় নেই, প্রতিযোগিতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তার উপর প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চয়তা, জীবনের, জীবিকার। তাই এই এলাকার বাসিন্দারা কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে চলে যান।

Facebook Page: WBCS Bengali Compulsory Paper | 18,000+ Followers | By Pathak Sir

সম্পাদক সমীপেষু: অ্যাসিডের ক্ষতি

গত মার্চ মাসে কলকাতায় ‘অ্যাসিড আক্রান্তদের আরোগ্য, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ২০ জন অ্যাসিড-আক্রান্ত মহিলা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগ, প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া দেননি, তাই আক্রান্ত।

সোমা মুখোপাধ্যায়ের ‘যারা শাস্তি দিতে পারে না, তারা মুখ লুকোক’ (১২-৩) শীর্ষক প্রতিবেদনটির প্রথম অনুচ্ছেদ পড়ে মনে হল— অ্যাসিড শুধু শরীর নয়, মানুষের মনকেও চিরকালের জন্য পুড়িয়ে দেয়।

গত মার্চ মাসে কলকাতায় ‘অ্যাসিড আক্রান্তদের আরোগ্য, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ২০ জন অ্যাসিড-আক্রান্ত মহিলা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগ, প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া দেননি, তাই আক্রান্ত। ছাড় পাননি বিবাহিত মহিলারাও এবং আক্রান্ত হওয়ার পর স্বামীরা তাঁদের পরিত্যাগ করেছেন। অ্যাসিড হামলায় ঝলসে যাওয়া মুখ, নষ্ট হয়ে যাওয়া চোখ নিয়েও কিন্তু তাঁরা হার মানেননি। কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে প্রতি দিন লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর একটি বিধানসভা ভোট দোরগোড়ায়। ঝলসে যাওয়া শরীর ও মন নিয়ে এ বারও তাঁরা গণতন্ত্রের মান্যতা বজায় রেখে ইভিএম-এর বোতাম টিপে কর্তব্যটুকু পালন করবেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা বা অবকাশ কি রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির! লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তাঁরা হয়তো পাচ্ছেন, কিন্তু আর কোনও দায়িত্ব কি নেই তাঁদের প্রতি? অথচ, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি অ্যাসিড হামলার ঘটনা ঘটেছে।

সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্টের একাধিক নির্দেশ অনুযায়ী, বার বার অ্যাসিড হানা রোধ কিংবা অ্যাসিড-আক্রান্তদের পরিচর্যা বা পাশে দাঁড়ানোর কথা মনে করানো হয়েছে প্রশাসনকে। কিন্তু এ রাজ্যে কি তা হয়েছে? পঞ্জাব অ্যাসিড-আক্রান্তদের জন্য মাসে ১০,০০০ টাকা এবং হরিয়ানা মাসে ৯,০০০ টাকার কাছাকাছি বরাদ্দ করেছিল; যদিও সেটা মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ক্ষতির তুলনায় যৎসামান্যই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ক্ষতিপূরণের নিরিখেও অনেক পিছিয়ে। আমাদের দেশে অ্যাসিড-আক্রমণের ঘটনাগুলি বেশির ভাগই ঘটে সমাজে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের মধ্যে। ভুক্তভোগীদের চিকিৎসার জন্য এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে ঘুরতে হয়, বিচারের জন্য কোর্টে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। মামলা করেও অপরাধীর শাস্তি তো দূর, অনেক সময় যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণও জোটে না। এক জন অপরাধী যখন শাস্তি না-পেয়ে ঘুরে বেড়ায় তখন আমাদের চার পাশের সমাজে সেই অপরাধের মান্যতা তৈরি হয়। আর, এই ক্ষোভই ভুক্তভোগীরা উগরে দেন

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

নানা দাবির মাধ্যমে। খোলা বাজারে অ্যাসিড বিক্রি বন্ধ হোক, এটা তাঁদের প্রধান দাবি। কিন্তু কে শোনে সে কথা! চিকিৎসার জন্য, আইনি কাজে তাঁদের কলকাতায় ছুটে আসতে হয় বার বার। সেই কারণেই, কলকাতায় তাঁদের থাকার একটি হোম তৈরির দাবিতেও তাঁরা সরব হয়েছেন। কিন্তু সে সব দাবির কতটুকু পূরণ হয়েছে?

Facebook Page: WBCS Bengali Compulsory Paper | 18,000+ Followers | By Pathak Sir

সম্পাদক সমীপেষু: উন্নয়নের নামে

একই চিত্র দেখা যাচ্ছে সুন্দরবনের মধু শিল্পেও। এই মধু শুধু একটি পণ্য নয়, এটি মধু সংগ্রাহকদের জীবনসংগ্রামের ফসল।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। নতুন সরকারে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের সমস্যা সমাধান এবং ইকো টুরিজ়ম গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই প্রতিশ্রুতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুন্দরবনের হাজার হাজার মানুষ প্রতি দিন জীবন হাতে নিয়ে নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরতে যান। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কুমির, বাঘ, জলদস্যু— সব কিছুর সঙ্গে লড়াই করেই জীবিকার সংস্থান করেন তাঁরা। অথচ, সেই মাছ বাজারে পৌঁছনোর আগে বহু হাত বদল হয়, দামও কয়েক গুণ বেড়ে যায়। কলকাতা থেকে আন্তর্জাতিক বাজার— সব জায়গাতেই লাভের অঙ্ক বাড়ে, অথচ যাঁদের শ্রম ও ঝুঁকির উপর এই অর্থনীতি দাঁড়িয়ে, সেই জেলেদের ভাগ্যে জোটে সামান্য অর্থ। ফলে সুন্দরবনের বহু যুবক আজ বাধ্য হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছেন। কেউ কেরলে নির্মাণ শ্রমিক, কেউ গুজরাতে কারখানায়, কেউ দিল্লির অচেনা শহরে দিনমজুর। নদীর পাড়ে জন্ম নেওয়া মানুষকে জীবিকার সন্ধানে ভিটেমাটি ছেড়ে বহু দূর চলে যেতে হচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে ‘ইকো টুরিজ়ম’ এখন বহুল উচ্চারিত শব্দ। শুনতে পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষের মনে এর সঙ্গে আশার পাশাপাশি আশঙ্কাও জড়িয়ে আছে। কারণ দেশের নানা প্রান্তে দেখা গেছে, পর্যটনের নামে পাহাড়, জঙ্গল ও সমুদ্রতট ধীরে ধীরে কয়েকটি বড় কর্পোরেট সংস্থার নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। তাই আজ প্রশ্ন উঠছে— সুন্দরবনের ইকো টুরিজ়ম কি সরকারের সহায়তায় স্থানীয় মানুষের হাতে গড়ে উঠবে, না কি বড় সংস্থাগুলির রিসর্ট, জেটি ও বাণিজ্যিক প্রকল্পে ভরে যাবে দ্বীপাঞ্চল? যদি স্থানীয় মানুষকে বাদ দিয়ে কর্পোরেটভিত্তিক পর্যটন গড়ে ওঠে, তবে তা শুধু পরিবেশের ক্ষতিই করবে না, অর্থনৈতিক বৈষম্যও তৈরি করবে। সুন্দরবনের মানুষ তখন নিজের ভূমিতেই দর্শক হয়ে পড়বেন।

একই চিত্র দেখা যাচ্ছে সুন্দরবনের মধু শিল্পেও। এই মধু শুধু একটি পণ্য নয়, এটি মধু সংগ্রাহকদের জীবনসংগ্রামের ফসল। বাঘের ভয়, নদীর স্রোত, ঝড়— সব উপেক্ষা করে তাঁরা মধু সংগ্রহ করেন। অথচ, এখন বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা নিয়ন্ত্রিত ভাবে বাক্স বসিয়ে মধু সংগ্রহ করছে এবং সেই মধু আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা করছে। অন্য দিকে, সাধারণ সংগ্রাহকদের জঙ্গলে প্রবেশের সময়সীমা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আরও প্রশ্ন হল, মধু প্রক্রিয়াকরণ ও পরিশোধনের ব্যবস্থা কেন সল্ট লেক-কেন্দ্রিক হবে? এই শিল্প যদি কাকদ্বীপ, গোসাবা বা জয়নগর এলাকায় গড়ে উঠত, তা হলে কি হাজার হাজার স্থানীয় মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থান হত না? উৎপাদন সুন্দরবনে, ঝুঁকি সুন্দরবনের মানুষের, অথচ প্রক্রিয়াকরণ ও মুনাফা শহরে— এই বৈষম্যে কি কোনও অঞ্চলের সুস্থায়ী উন্নয়ন হতে পারে?

সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হলে শুধু প্রকৃতি নয়, এখানকার মানুষকেও বাঁচাতে হবে। উন্নয়নের নামে যদি স্থানীয় মানুষ ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়েন, তবে সেই উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত সুন্দরবনের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করবে।

Facebook Page: WBCS Bengali Compulsory Paper | 18,000+ Followers | By Pathak Sir

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদক সমীপেষু: প্রবেশিকায় গাফিলতি

ছাত্রজীবনের প্রায় সবটুকু উজাড় করে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতিতে জল ঢেলে দিল চরম প্রশাসনিক গাফিলতি। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে হয়েছে, এমন তথ্য পুলিশি তদন্তে এসেছে।

‘ব্যর্থ’ (১৬-৫) শীর্ষক সম্পাদকীয়তে এ বছর ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের পিছনে সরকারি নজরদারিতে ‘বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো’ ব্যবস্থাপনার কথা যথার্থ বলা হয়েছে। ২০২৪-এর মতো এবারও প্রায় ২৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রী কেলেঙ্কারির কুশীলবদের হাত থেকে রক্ষা পেল না। খবরে প্রকাশ, পরীক্ষা বাতিলের কারণে একাধিক পরীক্ষার্থী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। কারণটা হয়তো এ বারের পরীক্ষা ভাল হয়েছিল। কিন্তু বাতিলের কারণে নতুন যে পরীক্ষা ঘোষিত হয়েছে, সেটি ভাল না-ও হতে পারে।

এর দায় কার? ছাত্রজীবনের প্রায় সবটুকু উজাড় করে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতিতে জল ঢেলে দিল চরম প্রশাসনিক গাফিলতি। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে হয়েছে, এমন তথ্য পুলিশি তদন্তে এসেছে। সুতরাং, মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ খেলা চলছে নিরন্তর। তদন্ত এগোলে হয়তো দেখা যাবে বহু বছর ধরে সর্ষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সরকারপোষিত ভূতেদের সাহায্যেই ফাটকাবাজরা এমন কাজ চালাচ্ছে। বিনিময়ে ভূতেদের পকেটে কোটি কোটি টাকা ঢুকছে।

ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য দেশের কোচিং সেন্টারগুলির উপর অবশ্যই সরকারি নজরদারি প্রয়োজন। সেই কাজ এখন শুরু হয়েছে। তা ছাড়া এই সব দুর্নীতিগ্রস্ত ফাটকাবাজের হাত থেকে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষাকে রক্ষা করার জন্য পরীক্ষার পদ্ধতিতেও কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। অন্যান্য সর্বভারতীয় চাকরির প্রবেশিকাতে দুই বা তার অধিক ধাপে পরীক্ষা নেওয়া হয়। একটু উচ্চ পদে হলে দ্বিতীয় ধাপের পরে ইন্টারভিউ হয়। সেখানে এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা কেন শুধুমাত্র এক ধাপেই নেওয়া হবে? প্রথম ধাপে যদি অন্যান্য সর্বভারতীয় পরীক্ষার মতো প্রিলিমিনারি এবং দ্বিতীয় ধাপে মেন পরীক্ষা নেওয়া হয়, তা হলে হয়তো জালিয়াতদের জালিয়াতি করার সুযোগ অনেকটা কমবে। জালিয়াতির সুযোগ আরও কমবে যদি মেন পরীক্ষায় পাশ করার পর তৃতীয় ধাপে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্টিভ পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে, যেখানে চিকিৎসা পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু প্রশ্ন থাকবে। এই তিন পরীক্ষার সম্মিলিত মানের মাধ্যমে অবশ্যই সুচিকিৎসক গড়ে তোলার মতো মেধাবী ছাত্রছাত্রী পাওয়া যেতে পারে।

Facebook Page: WBCS Bengali Compulsory Paper | 18,000+ Followers | By Pathak Sir

সম্পাদক সমীপেষু: ধ্বংসের পথে

বন দফতরের বিভিন্ন রিপোর্ট এবং পরিবেশবিদদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ কাটার বিপরীতে অন্তত পাঁচটি চারা রোপণের আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও, তার ‘সারভাইভাল রেট’ বা বেঁচে থাকার হার অত্যন্ত হতাশাজনক।

গত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশে পরিকাঠামো উন্নয়নের যে জোয়ার এসেছে, তার উল্টো পিঠে পরিবেশগত বিপর্যয়ের এক করুণ চিত্র ফুটে উঠছে। বিশেষ করে পাতালরেল প্রকল্প, জাতীয় সড়ক প্রশস্তকরণ এবং গঙ্গার উপর নতুন নতুন সেতু নির্মাণের জন্য যে বিপুল সংখ্যক প্রাচীন বৃক্ষছেদন করা হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ আজ অবধি সম্ভব হয়নি।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

বন দফতরের বিভিন্ন রিপোর্ট এবং পরিবেশবিদদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ কাটার বিপরীতে অন্তত পাঁচটি চারা রোপণের আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও, তার 'সারভাইভাল রেট' বা বেঁচে থাকার হার অত্যন্ত হতাশাজনক। পরিসংখ্যান বলছে, রোপণ করা চারার প্রায় ৬০–৭০ শতাংশই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এক বছরের মধ্যে মারা যায়। অথচ, একটি পূর্ণবয়স্ক বট বা অশ্বত্থ গাছ বছরে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং বায়ুমণ্ডল শীতল রাখে, তার অভাব পূরণে শত শত চারাগাছের প্রয়োজন হয়।

ফলে, বর্তমানে আমরা একাধিক সঙ্কটের সম্মুখীন। যেমন, হিট আইল্যান্ড এফেক্ট। বনভূমি নিধনের ফলে কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলির তাপমাত্রা পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের তুলনায় ৪–৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকছে। কংক্রিটের জঙ্গল তাপ ধরে রাখছে, আর তা প্রশমিত করার মতো পর্যাপ্ত 'গ্রিন কভার' বা সবুজ আচ্ছাদন নেই। দুই, ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমছে। বড় বড় গাছ কাটা পড়ায় বৃষ্টির জল মাটির গভীরে যাওয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। জেলায় জেলায় জলসঙ্কট বাড়ছে। তিন, উষ্ণায়ন। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে এপ্রিল–মে মাসের গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক ডিগ্রি বেশি রেকর্ড করা হচ্ছে, যা সরাসরি বৃক্ষহীনতার ফলাফল।

ফলে উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এখন আর বিলাসিতা নয়, টিকে থাকার লড়াই। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাজেটে 'বৃক্ষ প্রতিস্থাপন' প্রযুক্তিকে বাধ্যতামূলক করা হোক, যাতে শতবর্ষী গাছগুলিকে কাটার পরিবর্তে অন্যত্র সরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এ ছাড়া, সড়ক বা রেল প্রকল্পের সমান্তরালে কেবলমাত্র শোভাবর্ধক গাছ না লাগিয়ে স্থানীয় প্রজাতির ছায়াপ্রদানকারী ও ফলদায়ী বৃক্ষ রোপণে জোর দেওয়া উচিত। আমরা যদি এখন থেকেই সচেতন না হই, তবে আগামী দু'–তিন দশকে হয়তো পশ্চিমবঙ্গ এক তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উন্নয়নের দোহাই দিয়ে এই 'সবুজ ধ্বংস'–এর দায় আমরা এড়াতে পারব না।

Facebook Page: WBCS Bengali Compulsory Paper | 18,000+ Followers | By Pathak Sir

সম্পাদক সমীপেষু: সমন্বয় দরকার

এই ব্যবস্থার বড় সুবিধা হল, এটি জীববৈচিত্র রক্ষা করে। আগে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের দেশি বীজ ব্যবহার হত।

বর্তমান বিশ্বে কৃষি এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, অনিয়মিত বৃষ্টি, খরা, বন্যা, নতুন রোগ— সব মিলিয়ে ফসল উৎপাদন অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি বড় সমস্যা— বীজের বৈচিত্র দ্রুত কমে যাওয়া। এই পরিস্থিতিতে বীজ ভান্ডার বা সিড ব্যাঙ্ক-এর গুরুত্ব নতুন করে সামনে এসেছে। বীজ ভান্ডার বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে বিভিন্ন ফসলের বীজ দীর্ঘ দিন ধরে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। প্রয়োজনে সেই বীজ আবার ব্যবহার করা যায়। একে অনেকেই ভবিষ্যতের 'বিমা' হিসেবে দেখেন। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে এই সংরক্ষিত বীজ থেকে আবার চাষ শুরু করা সম্ভব।

এই ব্যবস্থার বড় সুবিধা হল, এটি জীববৈচিত্র রক্ষা করে। আগে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের দেশি বীজ ব্যবহার হত। এখন বেশি ফলনের আশায় অনেকেই এক ধরনের বীজের উপর নির্ভর করছেন। ফলে পুরনো, স্থানীয় বীজ হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই দেশি বীজের মধ্যেই অনেক সময় খরা সহ্য করার ক্ষমতা বা রোগ প্রতিরোধের শক্তি থাকে। বীজ ভান্ডার সেই বৈচিত্র ধরে রাখতে সাহায্য করে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গবেষণা। সংরক্ষিত বীজ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা নতুন ও উন্নত জাতের ফসল তৈরি করতে পারেন, যা ভবিষ্যতের পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এতে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সহজ হয়। তবে বীজ ভান্ডারের কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। প্রথমত, এটি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ নয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও পরিবেশ বজায় রাখতে হয়, নিয়মিত পরীক্ষা করতে হয়— যা ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত, শুধু বীজ সংরক্ষণ করলেই হবে না, সেগুলিকে মাঠে ব্যবহারও করতে হবে। না হলে বীজের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কৃষকের অধিকার। বর্তমানে বড় বড় কোম্পানি বীজের বাজারে প্রভাব বাড়াচ্ছে। এর ফলে অনেক সময় কৃষক নিজের মতো করে বীজ ব্যবহার বা সংরক্ষণ করতে পারেন না। এই অবস্থায় বীজ ভান্ডার যদি শুধুমাত্র বড় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তা হলে সাধারণ কৃষকের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই কারণে গ্রামভিত্তিক বা কমিউনিটি বীজ ভান্ডারের গুরুত্ব বাড়ছে। এখানে কৃষকরাই বীজ সংরক্ষণ করেন, অন্যের সঙ্গে বিনিময় করেন এবং স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী চাষ করেন। এতে কৃষক আরও স্বনির্ভর হন এবং বীজের উপর স্ব-অধিকার বজায় রাখতে পারেন। তবে এটি একমাত্র সমাধান নয়। এর সঙ্গে কৃষকের অংশগ্রহণ, স্থানীয় বীজের ব্যবহার এবং সঠিক নীতি গ্রহণ— সব কিছুর সমন্বয় দরকার।

সম্পাদক সমীপেষু: স্মার্টফোন নিয়ন্ত্রণ

গৃহকোণে বাবা-মা ও অন্য বড়রা, বিদ্যালয়ে মানুষ গড়ার কারিগরগণ সকলেই কারণে-অকারণে মোবাইলে মশগুল।

‘বড়রা যে দৃষ্টান্ত তৈরি করছেন’ (১৬-৪) শীর্ষক প্রবন্ধে অন্বেষা দত্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে তুলে ধরেছেন। একটি নির্দিষ্ট বয়সের আগে ছেলেমেয়েদের সমাজমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পথে বেশ কয়েকটি দেশ ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। হয়তো আমাদের দেশেও এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে আলোচনা শুরু হবে।

এই প্রসঙ্গে বড়দের দায়িত্ব কতটা এবং বড়রা বাচ্চাদের কী শেখাচ্ছি— এই প্রশ্ন অবশ্যই ওঠা দরকার। গৃহকোণে বাবা-মা ও অন্য বড়রা, বিদ্যালয়ে মানুষ গড়ার কারিগরগণ সকলেই কারণে-অকারণে মোবাইলে মশগুল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের ভুলিয়ে রাখার জন্য বড়রা তাদের হাতে মোবাইল দিয়ে নিজেরা নিশ্চিন্তে থাকেন। শৈশব-কৈশোরে স্মার্টফোনের প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলছি আমরা বড়রা। গ্রামাঞ্চলে গরিব পরিবারের বাবা-মায়েরা হয়তো নিজেদের সংসার চালানোর দায় বহন করতে হিমশিম খাচ্ছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই এত সময় বা সুযোগ নেই স্মার্টফোন নিয়ে মেতে থাকার, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে ধার-দেনা করেও সন্তানের হাতে স্মার্টফোন তুলে দিচ্ছেন। তার পরে একটু বড় হলে রাজ্য সরকারও এত দিন স্কুলপড়ুয়াদের স্মার্টফোন উপহার দিয়েছে। ফলে স্মার্টফোন ব্যবহারের ভাল-মন্দ বোঝার আগেই তাদের হাতে চলে আসছে এক আনন্দময় জগতের হাতছানি।

এখন ট্রেনে-বাসে পরিচিত জনেরা পাশাপাশি থাকলেও কেউ কাউকে খেয়াল করেন না, কারণ সকলের মন থাকে সেই আশ্চর্য যন্ত্রের পর্দায়। বাড়িতে ছোটরা বড়দের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয় ওই একই কারণে। উপযুক্ত সময় ও মনোযোগ না পেয়ে তারা অনেক সময়ই বিপথগামী হয়। এর জন্য সব দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার আগে বড়দের দায়িত্বটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয় স্তরে স্মার্টফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা দরকার। বাড়িতেও অভিভাবকদের ফোনের ব্যবহার নিজেদেরই নিয়ন্ত্রণ করে সেই সময় সন্তানকে দিতে হবে। বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত জানানো হোক স্মার্টফোন ব্যবহারের ভাল-মন্দ দিকগুলির বিষয়ে। এতে সামাজিক সচেতনতা তৈরি হবে।

সম্পাদক সমীপেষু: ভারসাম্য জরুরি

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

গণতন্ত্র কি শুধু জনসংখ্যার অঙ্কে নির্ধারিত হবে, না কি ন্যায় ও ভারসাম্যের নীতিতেও পরিচালিত হবে? যে রাজ্যগুলি দীর্ঘ দিন ধরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে, তারা যদি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে পিছিয়ে পড়ে, তবে তা এক ধরনের নীতিগত বৈপরীত্য তৈরি করে।

সীমানা পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন) ও নারী সংরক্ষণ— এই দুই বিষয়কে ঘিরে বিতর্ক কেবল রাজনৈতিক অবস্থানগত সংঘর্ষ নয়; এটি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, অর্থনৈতিক পুনর্বণ্টন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জটিল সংযোগস্থল। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব যাতে কমে না যায়, সেই কারণেই ২০২৬ সাল পর্যন্ত আসন পুনর্বণ্টন স্থগিত রাখা হয়েছিল। ডিলিমিটেশন কার্যকর হলে পশ্চিমবঙ্গের আসনসংখ্যা বর্তমান ৪২ থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়তে পারে— অনুমান করা হচ্ছে তা ৬৩ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো জনবহুল রাজ্যগুলির আসন আরও বেশি হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সংখ্যাগত বৃদ্ধি সত্ত্বেও জাতীয় রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে একটি মৌলিক প্রশ্ন— গণতন্ত্র কি শুধু জনসংখ্যার অঙ্কে নির্ধারিত হবে, না কি ন্যায় ও ভারসাম্যের নীতিতেও পরিচালিত হবে? যে রাজ্যগুলি দীর্ঘ দিন ধরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে, তারা যদি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে পিছিয়ে পড়ে, তবে তা এক ধরনের নীতিগত বৈপরীত্য তৈরি করে। আবার নারী সংরক্ষণের বিষয়টিও ডিলিমিটেশনের সঙ্গে বেঁধে দেওয়ায় প্রশ্ন উঠছে, নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কেন আরও বিলম্বিত করা হবে। গণতন্ত্রের লক্ষ্য কেবল সংখ্যাগত প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি নয়, বরং এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে উন্নয়ন, ন্যায়বিচার এবং আঞ্চলিক স্বার্থ— সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। আসন বাড়ে সংখ্যায়, উন্নয়ন বাড়ে নীতিতে— এই পার্থক্যটি না বুঝলে ডিলিমিটেশন ও নারী সংরক্ষণের প্রকৃত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা কঠিন হবে।

সম্পাদক সমীপেষু: ধ্বংসের পথে

বন দফতরের বিভিন্ন রিপোর্ট এবং পরিবেশবিদদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ কাটার বিপরীতে অন্তত পাঁচটি চারা রোপণের আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও, তার ‘সারভাইভাল রেট’ বা বেঁচে থাকার হার অত্যন্ত হতাশাজনক।

গত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশে পরিকাঠামো উন্নয়নের যে জোয়ার এসেছে, তার উল্টো পিঠে পরিবেশগত বিপর্যয়ের এক করুণ চিত্র ফুটে উঠছে। বিশেষ করে পাতালরেল প্রকল্প, জাতীয় সড়ক প্রশস্তকরণ এবং গঙ্গার উপর নতুন নতুন সেতু নির্মাণের জন্য যে বিপুল সংখ্যক প্রাচীন বৃক্ষছেদন করা হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ আজ অবধি সম্ভব হয়নি।

বন দফতরের বিভিন্ন রিপোর্ট এবং পরিবেশবিদদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ কাটার বিপরীতে অন্তত পাঁচটি চারা রোপণের আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও, তার ‘সারভাইভাল রেট’ বা বেঁচে থাকার হার অত্যন্ত হতাশাজনক। পরিসংখ্যান বলছে, রোপণ করা চারার প্রায় ৬০-৭০ শতাংশই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এক বছরের মধ্যে মারা যায়। অথচ, একটি পূর্ণবয়স্ক বট বা অশ্বত্থ গাছ বছরে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং বায়ুমণ্ডল শীতল রাখে, তার অভাব পূরণে শত শত চারাগাছের প্রয়োজন হয়।

ফলে, বর্তমানে আমরা একাধিক সঙ্কটের সম্মুখীন। যেমন, হিট আইল্যান্ড এফেক্ট। বনভূমি নিধনের ফলে কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলির তাপমাত্রা পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের তুলনায় ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকছে। কংক্রিটের জঙ্গল তাপ ধরে রাখছে, আর তা প্রশমিত করার মতো পর্যাপ্ত ‘গ্রিন কভার’ বা সবুজ আচ্ছাদন নেই। দুই, ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমছে। বড় বড় গাছ কাটা পড়ায় বৃষ্টির জল মাটির গভীরে যাওয়ার স্বাভাবিক

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। জেলায় জেলায় জলসঙ্কট বাড়ছে। তিন, উষ্ণায়ন। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে এপ্রিল–মে মাসের গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক ডিগ্রি বেশি রেকর্ড করা হচ্ছে, যা সরাসরি বৃক্ষহীনতার ফলাফল।

ফলে উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এখন আর বিলাসিতা নয়, টিকে থাকার লড়াই। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাজেটে 'বৃক্ষ প্রতিস্থাপন' প্রযুক্তিকে বাধ্যতামূলক করা হোক, যাতে শতবর্ষী গাছগুলিকে কাটার পরিবর্তে অন্যত্র সরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এ ছাড়া, সড়ক বা রেল প্রকল্পের সমান্তরালে কেবলমাত্র শোভাবর্ধক গাছ না লাগিয়ে স্থানীয় প্রজাতির ছায়াপ্রদানকারী ও ফলদায়ী বৃক্ষ রোপণে জোর দেওয়া উচিত। আমরা যদি এখন থেকেই সচেতন না হই, তবে আগামী দু'–তিন দশকে হয়তো পশ্চিমবঙ্গ এক তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উন্নয়নের দোহাই দিয়ে এই 'সবুজ ধ্বংস'–এর দায় আমরা এড়াতে পারব না।

সম্পাদক সমীপেষু: সমন্বয় দরকার

এই ব্যবস্থার বড় সুবিধা হল, এটি জীববৈচিত্র রক্ষা করে। আগে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের দেশি বীজ ব্যবহার হত।

সম্পাদক সমীপেষু: ব্যাগের ওজন

বেশ কয়েক বছর যাবৎ লক্ষ করছি যে, ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের শ্রেণিভিত্তিক রুটিনের বাইরেও নিজেরা ব্যাগে অতিরিক্ত বই খাতা ও অন্যান্য নানা সরঞ্জাম পুরে নেয়।

"'স্কুলের ব্যাগটা বড্ড ভারী', এ বার হালকা করার নির্দেশিকা" (২৩–৫) শীর্ষক প্রতিবেদনটি পাঠ করে মনে এল এক ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে রচিত রবীন্দ্রগানের স্থায়ী অংশটুকু– "এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও–/ ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়, এ যাত্রা তুমি থামাও।।" নিঃসন্দেহে সরকারি ও বেসরকারি–উভয় ক্ষেত্রেই পড়ুয়াদের ব্যাগের ওজন অত্যন্ত ভারী। বিষয়ভিত্তিক নানা বই (কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই বিষয়ের দু'জন ভিন্ন লেখকের বইও যুক্ত হয়) এবং সেই অনুসারে খাতাপত্রের মিলিত আয়োজনে ছোটদের পিঠে, কাঁধে ব্যথা ও নানা ধরনের শারীরিক অসুবিধার অভিযোগ শোনা যায়। প্রতি দিনের এই ব্যাগের সঙ্গে আরও জুড়ে থাকে বিভিন্ন বিষয়ের কর্মমুখী প্রকল্পের কাজ ও সেই সম্পর্কিত আর্ট পেপারের রোল, টিফিন বক্স, জলের বোতল, ছাতা প্রভৃতি হরেক বস্তু।

তবে, কর্মসূত্রে আরও একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরি। বেশ কয়েক বছর যাবৎ লক্ষ করছি যে, ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের শ্রেণিভিত্তিক রুটিনের বাইরেও নিজেরা ব্যাগে অতিরিক্ত বই খাতা ও অন্যান্য নানা সরঞ্জাম পুরে নেয়। উদ্দেশ্য– স্কুল ছুটি শেষেই সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থার আধারে উদ্ভাসিত 'টিউশনি' নামক পাঠশালায় দ্রুত গমন অথবা গান আঁকা নাচ থেকে ক্রিকেট কোচিং বা সুইমিং-এর ক্লাসগুলিতে সচেতন অংশগ্রহণ। ফলস্বরূপ, শৈশবকাল থেকেই দেহের ভার বহন ক্ষমতার চেয়ে অনেক গুণ বেশি ওজন বহন করতে বাধ্য হয় ছাত্রছাত্রীরা।

প্রকৃতপক্ষে, শিশুকালে স্কুল-ব্যাগের বোঝার ভার নামানোর মহৎ উদ্দেশ্যের আদেশনামা এলেও তার বাস্তব চিত্র বোধ হয় একই থাকবে, যার নেপথ্যে রয়ে যাবে অতিরিক্ত ওজন বহনের কুপ্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ অভিভাবককুল ও তাঁদের অসহায় সন্তানসন্ততি।

সম্পাদক সমীপেষু: খাবারের মান

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

২০২৬ সালের বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবসের প্রতিপাদ্য হল 'ফ্রম বার্ডেন টু সলিউশনস– সেফ ফুড এভরিহোয়্যার'।

প্রতি বছর ৭ জুন 'বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস' পালিত হয়। ২০১৮ সালের ২০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ 'বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস' ঘোষণার লক্ষ্যে ৭৩/২৫০ নম্বর প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। ২০১৯ সাল থেকে প্রতি বছরের ৭ জুন নিরাপদ খাদ্যের নানাবিধ সুফল উদ্‌যাপনের দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী খাবারের গুণগত মান সঠিক রাখা এবং খাদ্য-নিরাপত্তা বিষয়ে সকলকে সচেতন করাই এই দিবসের উদ্দেশ্য। সঠিক পরিমাণ এবং নিরাপদ খাদ্যই জীবন রক্ষা এবং সুস্বাস্থ্যের মূল চাবিকাঠি। খাদ্যবাহিত অসুস্থতা সাধারণত সংক্রামক বা বিষাক্ত প্রকৃতির হয় এবং প্রায়শই নীরবে শরীরে প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন করে। ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস বা রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে এটি মানবশরীরে ঢোকে। খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিটি পর্যায়ে– উৎপাদন থেকে শুরু করে ফসল কাটা, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং ব্যবহার– খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে খাদ্য-নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দূষিত খাদ্য রোগ ও অর্থনৈতিক ক্ষতির এক দুষ্টচক্র তৈরি করে– এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁরাই, যাঁদের সম্পদ, রাজনৈতিক ক্ষমতা কিংবা নিরাপদ জীবনযাপনের সুযোগ– কোনওটিই নেই। পরিসংখ্যান বলছে, দূষিত খাবার খেয়ে প্রতি বছর বিশ্ব জুড়ে আনুমানিক ৪,২০,০০০ মানুষ মারা যান এবং ৫ বছরের কম বয়সি শিশুরা খাদ্যবাহিত রোগের ৪০% বোঝা বহন করে, যার জেরে প্রতি বছর ১২৫,০০০ শিশুর মৃত্যু হয়। ২০২৬ সালের বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবসের প্রতিপাদ্য হল 'ফ্রম বার্ডেন টু সলিউশনস– সেফ ফুড এভরিহোয়্যার'। এটি তুলে ধরে যে, অসুস্থতা, এবং প্রাণহানি সংক্রান্ত তথ্য কী ভাবে সুনির্দিষ্ট ও সাশ্রয়ী সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ করার দিক-নির্দেশ করতে পারে। সেই সঙ্গে আমাদের ভোলা উচিত নয়, আমরা উপভোক্তা, খাদ্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা নীতিনির্ধারক– যা-ই হই না কেন, খাদ্য নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে আমাদের একটি ভূমিকা রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে কৃষি এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, অনিয়মিত বৃষ্টি, খরা, বন্যা, নতুন রোগ— সব মিলিয়ে ফসল উৎপাদন অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি বড় সমস্যা— বীজের বৈচিত্র দ্রুত কমে যাওয়া। এই পরিস্থিতিতে বীজ ভান্ডার বা সিড ব্যাঙ্ক-এর গুরুত্ব নতুন করে সামনে এসেছে। বীজ ভান্ডার বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে বিভিন্ন ফসলের বীজ দীর্ঘ দিন ধরে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। প্রয়োজনে সেই বীজ আবার ব্যবহার করা যায়। একে অনেকেই ভবিষ্যতের 'বিমা' হিসেবে দেখেন। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে এই সংরক্ষিত বীজ থেকে আবার চাষ শুরু করা সম্ভব।

এই ব্যবস্থার বড় সুবিধা হল, এটি জীববৈচিত্র রক্ষা করে। আগে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের দেশি বীজ ব্যবহার হত। এখন বেশি ফলনের আশায় অনেকেই এক ধরনের বীজের উপর নির্ভর করছেন। ফলে পুরনো, স্থানীয় বীজ হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই দেশি বীজের মধ্যেই অনেক সময় খরা সহ্য করার ক্ষমতা বা রোগ প্রতিরোধের শক্তি থাকে। বীজ ভান্ডার সেই বৈচিত্র ধরে রাখতে সাহায্য করে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গবেষণা। সংরক্ষিত বীজ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা নতুন ও উন্নত জাতের ফসল তৈরি করতে পারেন, যা ভবিষ্যতের পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এতে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা সহজ হয়। তবে বীজ ভান্ডারের কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। প্রথমত, এটি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ নয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও পরিবেশ বজায় রাখতে হয়, নিয়মিত পরীক্ষা করতে হয়— যা ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত, শুধু বীজ সংরক্ষণ করলেই হবে না, সেগুলিকে মাঠে ব্যবহারও করতে হবে। না হলে বীজের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কৃষকের অধিকার। বর্তমানে বড় বড় কোম্পানি বীজের বাজারে প্রভাব বাড়াচ্ছে। এর ফলে অনেক সময় কৃষক নিজের মতো করে বীজ ব্যবহার বা সংরক্ষণ করতে পারেন না। এই অবস্থায় বীজ ভান্ডার যদি শুধুমাত্র বড় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তা হলে সাধারণ কৃষকের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই কারণে গ্রামভিত্তিক বা কমিউনিটি বীজ ভান্ডারের গুরুত্ব বাড়ছে। এখানে কৃষকরাই বীজ সংরক্ষণ করেন, অন্যের সঙ্গে বিনিময় করেন এবং স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী চাষ করেন। এতে কৃষক আরও স্বনির্ভর হন

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

এবং বীজের উপর স্ব-অধিকার বজায় রাখতে পারেন। তবে এটি একমাত্র সমাধান নয়। এর সঙ্গে কৃষকের অংশগ্রহণ, স্থানীয় বীজের ব্যবহার এবং সঠিক নীতি গ্রহণ— সব কিছুর সমন্বয় দরকার।

সম্পাদক সমীপেষু: রুজিরুটির প্রশ্ন

শিক্ষা যদি সব অবৈধ দোকান আর হকারদের দিতে হয়, তা হলে বড় বড় দোকান, মল, হোটেল, রেস্তরাঁ, দলনির্বিশেষে নেতাদের বাড়ি— এ সবই বা বাদ যাবে কেন?

পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার আসার পরে একটা বিষয় জোরালো হয়ে উঠেছে— অবৈধ ভাবে সরকারি জমি দখল করে থাকা ব্যবসার বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ। অবশ্য কিছু দিন আগে পর্যন্ত এই ছোটখাটো দোকানগুলো থেকেই খাবার খাওয়া হত কম খরচে, ছোটখাটো জিনিস কেনার জন্য এই দোকানগুলোই ছিল প্রধান ভরসা। আজ তারাই রাতারাতি ‘অবৈধ’ হয়ে গেছে।

রাজ্য জুড়ে এই হকার উচ্ছেদ প্রসঙ্গে অনেক দিক নিয়ে কথা হচ্ছে। যেমন— হকারদের দোকান দেওয়ার কোনও বৈধ কাগজ বা অনুমতি নেই, সরকার বা রেল নিজের জমি ফেরত নিচ্ছে, সে যে কারণেই হোক না কেন। তাতে সমস্যা কোথায়? এই কড়া পদক্ষেপ দরকার ছিল, অবৈধ দোকানদার, হকারদের শিক্ষা না দিলে তাঁদের প্রভাব বাড়তেই থাকবে এবং পরে এঁদের ওঠানো যাবে না, ইত্যাদি।

উত্তরে বলি, হকারদের অনেকের বৈধ কাগজপত্র বা অনুমতিপত্র নেই— এটা সত্যি। কিন্তু তাঁরা কেন সেই দোকান চালাচ্ছেন? অন্য কোনও কাজ তাঁদের নেই বলে, বা থাকলেও সেখানে রোজগার অনেক কম। তাঁদের প্রত্যেকের পরিবার আছে, সন্তান আছে, বয়স্ক বাবা-মা আছেন। একটা পরিবারের খরচ আজকের দিনে মাসে কত হতে পারে, যাঁরা রোজগার করেন, তাঁরা জানেন। এই দোকানদার বা হকারদের স্টেশন চত্বরে বা প্ল্যাটফর্মে দোকান খোলার অনুমতির বদলে সরকার একটা অর্থ নিয়ে ছেড়ে দিলে অসুবিধা কোথায়? এতে পরিবারগুলির রুজিরুটি থেকে গেল, আবার সরকারের ভাঁড়ারে কিছু অর্থও জমা হল। প্রয়োজনে কিছু শর্ত চাপিয়ে দেওয়া যায়— দোকান একটি নির্দিষ্ট আয়তনের হবে, চত্বর নোংরা করা যাবে না, ইত্যাদি। এই পরিবারগুলি আমাদেরই চেনা মানুষ। বিকল্প পথ তাঁদের জন্য তৈরি না করে দিয়ে উচ্ছেদ কি ঠিক? তা ছাড়া, তৃণমূল সরকার যখন সারা রাজ্য জুড়ে হকার বা অবৈধ দোকান উচ্ছেদ শুরু করে, তখন সেই সময়ের প্রধান বিরোধী দলও সরব হয়েছিল। আজ অন্যথা হল কেন?

শিক্ষা যদি সব অবৈধ দোকান আর হকারদের দিতে হয়, তা হলে বড় বড় দোকান, মল, হোটেল, রেস্তরাঁ, দলনির্বিশেষে নেতাদের বাড়ি— এ সবই বা বাদ যাবে কেন? শুধু এই ছোট হকাররাই তো অনুমতি ছাড়া দোকান চালাচ্ছেন না, অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানও বেশি জমি দখল করে বা অনুমতির বেশি উঁচু বিল্ডিং বানিয়েছে। আসলে, ইতিহাস সাক্ষী, এই সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজের গরিবরাই সহজ টার্গেট হন। তাঁদের হয়ে লড়ার কেউ থাকে না। তাঁদের টাকা নেই কোর্টে লড়ার, রাজনৈতিক ক্ষমতাও বিপদের দিনে পাশে থাকে না। কিন্তু বড় ব্যবসায়ীদের দুটোই আছে। তাই তাঁদের বিল্ডিং বা দোকানে সচরাচর বুলডোজ়ার চলে না, পুলিশ রাতে তাঁদের বিল্ডিং ভাঙতে আসে না।

সাধারণ মানুষদের বেশির ভাগই এই সব ছোট দোকান থেকে অপেক্ষাকৃত কম দামে জিনিস কেনে। রেলস্টেশনের ভিতরে একশো টাকার খাবারের বদলে তারা যদি ত্রিশ-চল্লিশ টাকায় খাবার পেয়ে যায়, তবে তারা দ্বিতীয়টাই নেবে। সে কথা ভাবা হল না। অনুমান, এই দোকানগুলি তুলে দেওয়ার পর আসবে বড় বড় কোম্পানির দোকান, যেখানে জিনিসের দাম সবার নাগালের মধ্যে থাকবে না। মানুষ বাধ্য হবে বেশি দামে জিনিস কিনতে। তখন হয়তো ছোট দোকানের গুরুত্ব বোঝা যাবে।

সম্পাদক সমীপেষু: সত্যের পক্ষে

বর্তমান সময়ে যাঁরা এই পেশায় আসছেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই ভালবাসা রয়েছে। কিন্তু বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবিকার তাগিদ।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

স্বাতী ভট্টাচার্যের লেখা ‘সংবাদের পুনরুদ্ধার’ (২২-৫) একটি সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। তথ্য ও উদাহরণসমৃদ্ধ এই বলিষ্ঠ লেখাটি মানবাধিকার ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে এক জোরালো বার্তা বহন করে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয় সংবাদমাধ্যমকে। সুস্থ জনমত গঠন এবং সমাজের দর্পণ হিসাবে এর কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ‘নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা’ শব্দবন্ধটি যেন এক মরীচিকা। সংবাদমাধ্যমের একটি বড় অংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা কর্পোরেট শক্তির প্রভাববলয়ে চলে গিয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের শাসকের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

অতীতে যাঁরা সাংবাদিকতা পেশায় আসতেন, তাঁদের মূল চালিকাশক্তি ছিল সততা, নিষ্ঠা এবং ভালবাসা। তাঁদের বলিষ্ঠ, তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভীক কলম সরকারের অন্যায্য সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠত। সাধারণ পাঠক সেই লেখায় সমৃদ্ধ হতেন, আর দুর্নীতিপরায়ণ শাসককুল থাকত তটস্থ। মনে পড়ে, বরুণ সেনগুপ্তের ক্ষুরধার লেখা যে দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হত, সে দিন তার চাহিদা থাকত তুঙ্গে। গৌরকিশোর ঘোষের মতো সাংবাদিকদের আপসহীন লেখনী আজও ইতিহাসের দলিল। জরুরি অবস্থার পর ইন্দিরা গান্ধীর পতন থেকে দেশ, রাজ্যের একাধিক পটপরিবর্তনে সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

বর্তমান সময়ে যাঁরা এই পেশায় আসছেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই ভালবাসা রয়েছে। কিন্তু বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবিকার তাগিদ। এই কঠোর বাস্তবতায় অনেক সময় সততা, নিষ্ঠা এবং তথ্যের নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিতে হয়। এই আপসের প্রক্রিয়ায় এক জন সাংবাদিককে প্রতিনিয়ত নিজের বিবেকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। সংসারের দায়বদ্ধতা ও জীবনের প্রয়োজন তাঁদের অনেক সময় এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য করে। তবে এই অন্ধকারের মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রমী সাংবাদিক রয়েছেন, যাঁরা প্রশাসনের লাল চোখ বা রাজনৈতিক চাপকে তোয়াক্কা না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরাই আজ সমাজের পথপ্রদর্শক এবং জনগণের চোখে আদর্শ সাংবাদিক।

গণতন্ত্রে যদি বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন ও জনকল্যাণের পথ রুদ্ধ হতে বাধ্য। শাসক দল সব সময় দেশবাসীর স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে না; অনেক সময় দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার ও সামগ্রিক উন্নয়নের পরিপন্থী। এই পরিস্থিতিতে ঠিক তথ্য ও সত্য সংবাদ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সংবাদমাধ্যমের পবিত্র কর্তব্য। তা না হলে দেশ ও দেশবাসীর অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে, যার অজস্র উদাহরণ বিশ্ব ইতিহাসে ছড়িয়ে রয়েছে।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল ধরে সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে সত্যের জয়গান গেয়ে এসেছেন। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপট যেন অনেকটাই ম্লান। মনে রাখা প্রয়োজন, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক পরিসরে একটি দেশের উদার, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা এই সময়ের অন্যতম প্রধান দাবি।

সম্পাদক সমীপেষু: সুশাসন ফিরুক

এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে প্রধান সমস্যা দারিদ্র। তা দূর করতে হলে সর্বস্তরের মানুষের হাতে কাজ পৌঁছে দিতে হবে।

জহর সরকারের ‘উদার সংস্কৃতি অটুট থাকুক’ (১১-৫) শীর্ষক প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা।

দীর্ঘ দিন ধরে শিল্পহীনতা, কর্মসংস্থানের অভাব এবং বিনিয়োগের অনিশ্চয়তা বাংলার অগ্রগতিকে বাধা দিয়েছে। তাই নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা, একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক পরিবেশ এবং এমন একটি শিল্পনীতি, যা শুধু বৃহৎ পুঁজিকেই নয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকেও সমান গুরুত্ব দেবে। একই সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং নবীন উদ্যোগের ক্ষেত্রেও নতুন দিশা দেখাতে হবে।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

বর্তমানের নব্য উদারবাদী অর্থনীতি যদিও ‘উন্নয়ন’ বলতে মূলত মোট দেশজ উৎপাদনের বৃদ্ধিকেই প্রাধান্য দেয়, কিন্তু ভারতের মতো দেশে শুধু সেই বৃদ্ধিই উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। কারণ এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে প্রধান সমস্যা দারিদ্র। তা দূর করতে হলে সর্বস্তরের মানুষের হাতে কাজ পৌঁছে দিতে হবে। জনবহুল এই দেশে প্রত্যেকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন। তাই নতুন সরকারকে মনে রাখতে হবে, বিপুল কর্মসংস্থান ছাড়া রাজনৈতিক পরিবর্তনের অর্থ কিন্তু অনেকটাই ফিকে হয়ে যাবে।

ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর একটি রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বদলে যাওয়া উচিত। তখন শুধুমাত্র দলীয় স্বার্থ নয়, সমগ্র রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। বিরোধীদের মর্যাদা দেওয়া এবং ভিন্নমতকে সম্মান করাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে উন্নয়নের সব পরিকল্পনাই প্রশ্নের মুখে পড়বে। তবে উন্নয়নের এই আলোচনার পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে— সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা। বহুত্ববাদী চরিত্রের এই রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণ বাড়লে তা সামাজিক স্থিতিশীলতার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। তাই উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক সংহতিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অতীতে বহু বার পরিবর্তনের আশায় হতাশ হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নতুন সরকারের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হল, তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষা করতে পারে। উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, স্বচ্ছতা এবং সামাজিক ন্যায়— এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই তাদের রাজ্য পরিচালনা করতে হবে। একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সুশাসন, ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চায়। যে সরকার এই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, তাকেই মানুষ সরিয়ে দিয়েছে— পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস বার বার সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সম্পাদক সমীপেষু: নাগরিক প্রত্যাশা

এক দিকে যেমন আট হাজারের উপর সরকারি ও সরকারপোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উঠে গিয়েছে, তেমনই স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে।

দিলীপ ঘোষের ‘দায়িত্ব পালনের প্রত্যাশা’ (১৩-৫) শীর্ষক প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা। নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে কিছু প্রত্যাশা মানুষের থাকবে, বিশেষত যেখানে আগের সরকার বিষয়ে জনগণের অভিজ্ঞতা খুব ভাল নয়। প্রথম প্রত্যাশা ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন। এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার ২০০৫-এর বিহারের আইনশৃঙ্খলার কথা বলেছেন। সত্যিই তখন বিহার একটি অবক্ষয়ী আইনের শাসনের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিহারের উপর দিয়ে যাওয়া দূরপাল্লার ট্রেনগুলি রাতের দিকে নিরাপদ ছিল না। সেই বিহারে ধীরে ধীরে হলেও আইনের লাগাম পরিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সাধারণ মানুষের চাহিদা খুব অল্প, প্রশাসনের সদিচ্ছা থাকলে সেটি পূরণ করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পুলিশকে দলদাসে পরিণত না করে তাকে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে দেওয়া হোক, যাতে পুলিশের উপর মানুষের ভরসা ফিরে আসে। রাজ্যে আইনের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে, সমাজে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা কমবে।

গত জমানায় সবচেয়ে বেশি আঘাত এসেছিল সরকারি শিক্ষায়। এক দিকে যেমন আট হাজারের উপর সরকারি ও সরকারপোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উঠে গিয়েছে, তেমনই স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। স্কুলগুলি উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। শিক্ষক নিয়োগের নিয়মমাফিক প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে পড়ে ছিল দীর্ঘ দিন। উচ্চশিক্ষার দিকে ছাত্রছাত্রীরা যাচ্ছে কম, কারণ তারা দেখেছে শিক্ষক নিয়োগে কী চরম দুর্নীতি এই রাজ্যে ঘটে গিয়েছে। সুতরাং সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর দিকে মন দিয়ে অন্তত তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সরকারের আশু কর্তব্য।

একই সঙ্গে কৃষক যাতে ফসলের ন্যায্য মূল্য পান, মধ্যস্বত্বভোগীরা যাতে কৃষকের লাভের পথে কাঁটা হয়ে না দাঁড়ান, যথেষ্ট হিমঘর গড়ে তুলে ফসল যাতে অনেক দিন পর্যন্ত সেখানে রাখা যায়, তার ব্যবস্থা করা উচিত। একই সঙ্গে রাজ্যে মাঝারি থেকে বড় শিল্পের আগমনও একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। শুধু প্রতিযোগিতামূলক ভাতা নীতি ছেড়ে মানুষের কর্মসংস্থানের পরিসর বাড়ানো এখন গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদক সমীপেষু: খেলাধুলার প্রত্যাশা

অ্যাথলেটিক্স-এ সাফল্য মাপা হয় সেকেন্ডের হিসাবে। নির্দিষ্ট মাপের মাঠ বা ট্র্যাক ছাড়া সেই অনুশীলন সম্ভব নয়।

ষাটের দশকে দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর হ্রদকেন্দ্রিক যে কংক্রিটের ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছিল, তার পরিপাটি ঘাসের মাঠের চার পাশ ঘেঁষে নির্মিত চারশো মিটার ট্র্যাকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ কলকাতা সংলগ্ন বিভিন্ন জেলার ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিয়মিত অ্যাথলেটিক্স অনুশীলন চলত। কিন্তু ২০১১ সালে সেই অনুশীলন বন্ধ হয়ে যায়। ২০২৬ সালে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করায়, ৯ মে নতুন সরকার শপথ নেওয়ার আগেই ৫ মে থেকে ছেলেমেয়েরা নতুন উৎসাহে কলকাতার প্রথম এই কংক্রিটের স্টেডিয়ামের ট্র্যাকে নেমে পড়ে। বহু দিন ধরে স্টেডিয়ামের ভিতরে চলেছে ক্ষমতাসীন দলের ঘনিষ্ঠ কয়েকটি ফুটবল ক্লাবের অনুশীলন, আর রাজ্য, জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরে পদকজয়ী ছেলেমেয়েরা গত পনেরো বছর ধরে অনুশীলন করে গিয়েছে স্টেডিয়ামের বাইরে। সল্ট লেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন, কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম কিংবা সন্তোষপুরের কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন— সবই ফুটবল স্টেডিয়াম হিসাবে গড়ে উঠলেও, সবুজ মাঠের চার পাশের চারশো মিটার ট্র্যাকে গ্রামগঞ্জ ও শহরতলির ছেলেমেয়েরা অ্যাথলেটিক্স-এর প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে না, এ কেমন ব্যবস্থা?

যে সব বিশিষ্ট প্রশিক্ষক গত আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে স্থানীয় প্রতিভাদের নিয়ে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি রাজ্য বা দেশের ভবিষ্যতের জন্য কিছু খেলোয়াড় গড়ে তুলতে পারেন, তাতেই তাঁদের শ্রম সার্থক হয়। যথাযথ পরিবেশ পেলে কেউ খেলোয়াড় হোক বা না-হোক, সুস্থ ও বলিষ্ঠ নাগরিক হিসাবেও তো গড়ে উঠতে পারে। রাজ্যে ক্রীড়া দফতর রয়েছে, রয়েছেন হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ-সহ মন্ত্রী ও পারিষদ। তাঁরা যদি ‘মাদার অব অল গেমস’ অ্যাথলেটিক্স নিয়ে সামান্য গুরুত্ব দিয়েও ভাবেন, তবে গ্রামীণ ছেলেমেয়েরা— যাদের অনেকের আর্থসামাজিক অবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল— নিজেদের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করার কিছুটা সুযোগ পাবে।

অ্যাথলেটিক্স-এ সাফল্য মাপা হয় সেকেন্ডের হিসাবে। নির্দিষ্ট মাপের মাঠ বা ট্র্যাক ছাড়া সেই অনুশীলন সম্ভব নয়। তাই নতুন সরকারের আমলে ছেলেমেয়েরা যখন উৎসাহের সঙ্গে আবার স্টেডিয়ামে প্রবেশ করল, তখন বহু দিনের দমবন্ধ অবস্থা কাটিয়ে তারা যেন বুক ভরে শ্বাস নিল। গ্রামবাংলার খেলাধুলা যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বহু দেশজ প্রতিভার অপমৃত্যু রোধ করা যাবে। নতুন সরকার এ বিষয়ে নজর দেবে— এটাই প্রত্যাশা।

সম্পাদক সমীপেষু: জরুরি স্বীকৃতি

পারিবারিক ও সামাজিক সম্পদ কখনও নারী-পুরুষের মধ্যে সমান ভাবে বন্টিত হয়নি। বরং ছেলেরাই বেশি সুবিধা পেয়ে এসেছে। প্রচলিত ধারণায় পুরুষকে পরিবারের কর্তা হিসাবে দেখা হত। স্ত্রী ও সন্তান তাঁর উপর নির্ভরশীল— এমনই ছিল সামাজিক বিশ্বাস।

‘কাজের মূল্য’ (১৯-৬) শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পরিবারে মেয়েদের গৃহশ্রমের আর্থিক মূল্য বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় তুলে ধরে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করি। কিছু সংযোজনের উদ্দেশ্যে এই পত্র।

পারিবারিক ও সামাজিক সম্পদ কখনও নারী-পুরুষের মধ্যে সমান ভাবে বন্টিত হয়নি। বরং ছেলেরাই বেশি সুবিধা পেয়ে এসেছে। প্রচলিত ধারণায় পুরুষকে পরিবারের কর্তা হিসাবে দেখা হত। স্ত্রী ও সন্তান তাঁর উপর নির্ভরশীল— এমনই ছিল সামাজিক বিশ্বাস। অর্থাৎ, পরিবারের কর্তাই আয়ের উৎস, অন্যরা কেবল

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

তার উপভোক্তা। এক সময় অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিও মূলত পরিবারের ওই পুরুষ সদস্যকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর 'মিসিং উইমেন' তত্ত্বের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, নারীকে উপেক্ষা করে অর্থনীতির বিশ্লেষণ কখনও পূর্ণ হতে পারে না। আজ অর্থনীতির চাকা আর শুধু পরিবারের কর্তার চার পাশে ঘোরে না। পরিবারের স্ত্রী ও সন্তানেরাও সম্পদ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাঁদের শ্রম ও অবদানও অর্থনীতিতে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে সেই সত্যেরই স্বীকৃতি মিলেছে। আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে, মেয়েরাই জাতির নির্মাতা; সংসারের জন্য তাঁদের কায়িক, মানসিক ও আবেগিক শ্রম বস্তুত অমূল্য। প্রচলিত ধারণায় মেয়েদের পরিবারের উপার্জনকারী সদস্যদের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করা হলেও, বাস্তবে উপার্জনকারী সদস্যেরাই মেয়েদের বেতনহীন গৃহশ্রমের উপর নির্ভরশীল।

আমাদের দেশে এখনও বহু অঞ্চলে বাড়ির মেয়েরাই রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে আনেন, রান্না করেন, বাসন মাজেন, ঘরদোর পরিষ্কার রাখেন, সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দেন এবং তাঁদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করেন। সুপ্রিম কোর্টের মতে, বেতনহীন গৃহশ্রমের আর্থিক মূল্য মাসে অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা। তবু এই শ্রমের বিনিময়ে পরিবারের হাতে কোনও নগদ অর্থ আসে না বলেই দীর্ঘ দিন ধরে মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কার্যত অদৃশ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। নারীর এই অবদানকে উপেক্ষা করে অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন কখনও সম্ভব নয়। আশার কথা, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় সেই দীর্ঘ দিনের পক্ষপাত কাটিয়ে অর্থনীতিকে আরও ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছে।

সম্পাদক সমীপেষু: সভ্যতার ভিত্তি

একটি সন্তানকে বড় করে তুলতে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, অসুস্থতার সময় শিয়রে বসে বিনিদ্র রাত কাটানো, শিক্ষিত ও প্রকৃত মানুষ করে তোলার জন্য পিতা-মাতার অন্তহীন ত্যাগ— এ সবই পাশে থাকার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সোমা মুখোপাধ্যায়ের 'ছেড়ে যাইনি, পাশেই আছি' (রবিবাসরীয়, ৭-৬) প্রবন্ধটি অনবদ্য। সভ্যতার আদিতে মানুষ জোটবদ্ধ হয়েছিল সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, আনন্দ-বেদনায় একে অপরের প্রয়োজন অনুভব করে। সেই জোটবদ্ধতা থেকেই পরিবার, পরিবার থেকে গ্রাম, শহর, নগর— সব কিছুর জন্ম হয়েছে 'পাশে থাকার' প্রতিশ্রুতি নিয়ে। কিন্তু স্বার্থপরতা, হিংসা, ঈর্ষা, রাগ, ক্রোধ, ক্ষমতা ও অর্থের লোভে আজকের সমাজ ক্রমশ একে অপরের পাশে থাকার মানসিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই পথ চলতে চলতে কেউ মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গেলেও অনেকেই তাকিয়ে না দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যান। অথচ সদ্য হাঁটতে শেখা একটি শিশুও নির্ভয়ে এগিয়ে যায়, কারণ তার বিশ্বাস— কেউ না কেউ তার পাশে আছেন।

একটি সন্তানকে বড় করে তুলতে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, অসুস্থতার সময় শিয়রে বসে বিনিদ্র রাত কাটানো, শিক্ষিত ও প্রকৃত মানুষ করে তোলার জন্য পিতা-মাতার অন্তহীন ত্যাগ— এ সবই পাশে থাকার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। অথচ আজকের সমাজে সেই মা-বাবারই অনেকের ঠাঁই হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে, সন্তানের সংসারে নয়। সম্পত্তি লিখিয়ে নেওয়া, মা-বাবাকে সন্তানের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া, অজানা স্টেশনে বা মেলায় ফেলে আসা, এমনকি তাঁদের উপর শারীরিক নির্যাতনের মতো পৈশাচিক ঘটনাও আজ আর বিরল নয়। যাঁদের বার্ধক্যে সন্তানের পাশে থাকার কথা, তাঁদের প্রতি অনেকেই আজ নির্মম।

আমার নিজের জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। বাবা মৃত্যুর আগে প্রায় এক বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। সেই সময় মা ও আমার বোনেরা সব সময় তাঁর পাশে ছিলেন। সেবা, যত্ন, মমতা ও ভালবাসা দিয়ে তাঁরা বাবার প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে রাখার নিরন্তর চেষ্টা করেছেন। তখন আমি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। আমি বাড়ি আসব শুনলেই বাবা বিছানা ছেড়ে গেট পর্যন্ত হেঁটে চলে আসতেন। আমি যত দিন বাড়িতে থাকতাম, তাঁকে হাসিখুশি দেখা যেত; ঘরের মধ্যে হাঁটাচলাও করতেন। মানুষের ভালবাসা ও বিশ্বাস কতখানি শক্তি জোগাতে পারে, আজও সেই কথা ভেবে বিস্মিত হই।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

শুধু বাবা-মা বা ভাই পাশে আছেন— এই বিশ্বাসে বহু স্বামী-পরিত্যক্তা, পণের অত্যাচারে ঘরছাড়া কিংবা পারিবারিক হিংসার শিকার মহিলা নতুন করে স্বাধীন ভাবে বাঁচার সাহস পেয়েছেন, তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আবার এর ঠিক উল্টো ছবিও দেখেছি। ‘আমার পাশে কেউ নেই’— এই অসহায় বোধ থেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে দেখেছি দু’জন মানুষকে। করোনা অতিমারির সময় মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে রেড ভলান্টিয়ারদের রোগী ও তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর অসংখ্য ঘটনা আজও মানুষের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সম্পাদক সমীপেষু: বাঘের সমস্যা

সুন্দরবনই পৃথিবীর অন্যতম একক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, যেখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাস। তথ্য বলছে, ভারতে বাঘের মোট আক্রমণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঘটে সুন্দরবনে।

‘সুন্দরবনে বাঘ বেড়েছে, দাবি গণনায়’ (৯-৬) শীর্ষক খবরে জানা গেল, সাম্প্রতিক বাঘশুমারিতে সুন্দরবনে বাঘ বেড়ে অন্তত ১১০টি হয়েছে। এই সুখবরের পাশাপাশি সুন্দরবনে চলতি মাসের শুরুতেই বাঘের হামলায় প্রাণ গিয়েছে একাধিক মৎস্যজীবী ও বনজীবীর। সুন্দরবনে বাঘের আতঙ্ক বা বাঘ-মানুষের সংঘাত বহু পুরনো হলেও, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে বাঘের আক্রমণে এমন প্রাণহানির ঘটনা বনাঞ্চল নির্ভর গরিব মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকায় উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে উঠছে নিরাপত্তার প্রশ্নটিও। সাম্প্রতিক সময়ে (যেমন, ২০২৫ ও ২০২৬ সাল) কুলতলি, গোসাবা ও গভীর জঙ্গলের বিভিন্ন খাঁড়িতে কাঁকড়া-মাছ ধরতে গিয়ে বেশ কয়েক জনের বাঘের পেটে যাওয়ার এবং নিখোঁজ হওয়ার খবরও উঠে এসেছে।

সুন্দরবনই পৃথিবীর অন্যতম একক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, যেখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাস। তথ্য বলছে, ভারতে বাঘের মোট আক্রমণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঘটে সুন্দরবনে। এ দিকে বাঘের সংখ্যা বাড়ায় তাদের বিচরণের জায়গাও প্রসারিত হয়েছে। এক শ্রেণির বাঘ-বিশেষজ্ঞের মতে, তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে জলে নুনের পরিমাণ বাড়ায় বাঘের মানুষখেকো আচরণ আরও বেড়েছে। শিকারের জন্য তাই তারা আরও বেশি লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। এ দিকে সুন্দরবনের জঙ্গলজীবী প্রান্তিক মানুষগুলির আয়ের আর অন্য কোনও পথ নেই। বন অধিকার আইনের আওতায় ‘কোর এরিয়া’ ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু গরিব মৎস্যজীবীদের সমস্যা কমছে না। বন দফতরের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, পেটের তাগিদে বাধ্য হয়ে গভীর জঙ্গলে কাঁকড়া-মাছ-মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁরা বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারাচ্ছেন। আবার অনেকের বৈধ নৌকা বা মাছ ধরার পারমিট থাকলেও, তাঁদের নানা হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে।

সুন্দরবনে বাঘ বৃদ্ধির খবরে পরিবেশ সংক্রান্ত আরও একটি জরুরি বিষয় এখানে যোগ করা যায়। বাঘ-বিশেষজ্ঞদের মতে, এই এলাকার বাস্তুতন্ত্র ও ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা থাকা উচিত ১১০ থেকে ১২০টির মধ্যে। তাই সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বাড়লে তা নিয়ে যথাযথ সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সুন্দরবন সংলগ্ন বনাঞ্চল জুড়ে ক্রমশ বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, চরম বেকারত্ব, দারিদ্রের পাশাপাশি অবৈধ শিকার ও সর্বোপরি উষ্ণায়নের মতো বিষয়গুলি বাঘের থাকার পক্ষেও প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তাই সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বাড়তে আমরা যতই খুশি হই না কেন, আগামী দিনে এই প্রাণীগুলি আর কত কাল এই অঞ্চলে সগৌরবে টিকে থাকতে পারবে, সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

সম্পাদক সমীপেষু: বাণিজ্যিক শিক্ষা

কোচিং সংস্কৃতির এত বাড়বাড়ন্ত হল কেন? কোনও সমাজে হঠাৎ করে এমন একটি নির্ভরশীলতা তৈরি হয় না। এর পিছনে অবশ্যই থাকে কাঠামোগত কিছু সমস্যা।

সন্দীপন নন্দী তাঁর ‘বিজ্ঞান পড়লে ভূগোল ফ্রি’ (১৩-৭) শীর্ষক প্রবন্ধে কোচিং সেন্টারের আধিক্য ও শিক্ষাব্যবস্থার যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির উল্লেখ করেছেন, সেই বিষয়ে কিছু কথা। কোচিং সেন্টারের অস্বাভাবিক

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

বিস্তার একটি জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। দেশের শহর থেকে গ্রাম— সব জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যেখানে শিক্ষার চেয়ে ফলাফল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবণতা শিক্ষাকে একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পরিণত করেছে, যেখানে 'ভাল নম্বর' পাওয়াই মূল লক্ষ্য, জ্ঞান অর্জন নয়।

কোচিং সংস্কৃতির এত বাড়বাড়ন্ত হল কেন? কোনও সমাজে হঠাৎ করে এমন একটি নির্ভরশীলতা তৈরি হয় না। এর পিছনে অবশ্যই থাকে কাঠামোগত কিছু সমস্যা। অনেক শিক্ষক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করতে পারেন না, অনেকে আবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে পারেন না। এক জন শিক্ষকের কাছে যখন ৫০–৬০ জন শিক্ষার্থী থাকে, তখন ব্যক্তিগত ভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে কোচিং সেন্টারের দিকে ঝোঁকে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। এই কাঠামোয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা এমন একটি সহায়ক ব্যবস্থার খোঁজ করে যা তাদের প্রশ্নপত্রের ধরন, সম্ভাব্য প্রশ্ন, শর্টকাট টেকনিক ইত্যাদি শেখাবে, তাও আবার তুলনামূলক ভাবে অনেক কম খরচের বিনিময়ে। কোচিং সেন্টারগুলি ঠিক এই জায়গাটিতেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সফল হওয়ার কৌশলের পাশাপাশি এমন কিছু শেখায়, যা অনেক সময় স্কুলের বা বাড়ির গৃহশিক্ষকের পাঠদানে অনুপস্থিত থাকে।

তবে কোচিং সেন্টারের এই রমরমার পিছনে অভিভাবকদের মানসিকতাও অনেকাংশে দায়ী। অনেক অভিভাবকই মনে করেন, 'কোচিং সেন্টারে না দিলে ভাল ফল সম্ভব নয়'। এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সন্তানের উপর অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে, তার শেখার প্রক্রিয়াকে বোঝা এবং সহযোগিতা করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাকে একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং তাদের বিকাশের পথে নিরন্তর একটি যাত্রা হিসেবে দেখতে হবে। তাই সবার আগে দরকার মানসিকতায় বদল। শুধু পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের নামিয়ে দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার কতটা ক্ষতি করা হচ্ছে, ভাবার সময় হয়েছে।

প্রয়োজন কেন

'বিজ্ঞান পড়লে ভূগোল ফ্রি' শীর্ষক সন্দীপন নন্দীর প্রবন্ধটি যুক্তিসঙ্গত। পাঠ্যবিষয় আরও ভাল ভাবে জানা বা পরীক্ষায় আরও ভাল নম্বর পাওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। একটা সময় যখন শিক্ষকদের বেতন ছিল খুবই স্বল্প, তখন সঙ্কটের মোকাবিলা করে সংসার নির্বাহের জন্য শিক্ষকদের বাড়তি রোজগারের বিষয়টিও অযৌক্তিক মনে হত না। কিন্তু বর্তমানে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা করে অতিরিক্ত উপার্জনের প্রয়োজন নেই। তবুও এক শ্রেণির শিক্ষক উচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গৃহশিক্ষকতা করছেন এবং আইন, বিধি ইত্যাদির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে যাচ্ছেন।

গৃহশিক্ষকতার পক্ষে বলা হয়, শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে যত্ন করে পড়ান না। যথাসময়ে পাঠ্যসূচি শেষ করেন না। এই ফাঁক পূরণের জন্যই পড়ুয়ারা কোচিং সেন্টারে বা গৃহশিক্ষকদের কাছে যেতে বাধ্য হয়। আবার বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকাটাও একটা বড় কারণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এখনও যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক আছেন, সেখানেও পড়ুয়ারা প্রাইভেট টিউশনের উপরেই নির্ভর করে। আমাদের সমাজ ও সরকারকে ভাবতে হবে মূল প্রশ্নটি সম্পর্কে— কেন শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের মধ্যেই পড়ুয়াদের চাহিদা পূরণ করা যাবে না? আমাদের রাজ্যেই মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার সময় যে সব আশ্রমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সাফল্যের শীর্ষে উঠে আসে, সেখানের পড়ুয়ারা কোনও প্রাইভেট টিউশন নিতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তাদের তৈরি করে দেওয়া হয়। তা হলে সরকারি ও সরকারপোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি কেন অনুরূপ দায়িত্ব পালন করবে না? সমস্যা শুধু সরকারি বেতনভোগী শিক্ষকরা গৃহশিক্ষকতা করছেন বলে নয়, মূল সমস্যা সমান্তরাল প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

বিদ্যালয়ে দিনের পর দিন পড়ুয়ারা অনুপস্থিত থাকে প্রাইভেট টিউশনের কারণে। তাদের একাংশের কাছে বিদ্যালয় শুধু নাম নথিভুক্তির জন্যই। শিক্ষাকে আদর্শের জায়গা থেকে সরিয়ে পণ্যে পরিণত করার এই অবাধ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিকদের সরব হতেই হবে।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদক সমীপেষু: শিক্ষকের মূল্যায়ন

আজকের পৃথিবী দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং নতুন কর্মক্ষেত্রের চাহিদা শিক্ষার সংজ্ঞাকেই বদলে দিয়েছে। তথ্য মুখস্থ করার চেয়ে এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সৃজনশীলতা, দলগত কাজ এবং যোগাযোগের সক্ষমতা।

শিক্ষার মান নিয়ে আলোচনা হলেই প্রথমে উঠে আসে ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল, নম্বর কিংবা পরীক্ষায় সাফল্যের প্রসঙ্গ। অথচ,যে মানুষটি প্রতি দিন শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্বগড়ে তুলছেন, সেই শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন ও মূল্যায়নের বিষয়টি খুব কমই আলোচনায় আসে। একটি দেশের শিক্ষার মান শুধু পাঠ্যক্রম বা পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে না, অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষকের দক্ষতা, নিষ্ঠা এবং সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলে নেওয়ার ক্ষমতার উপরেও।

আজকের পৃথিবী দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং নতুন কর্মক্ষেত্রের চাহিদা শিক্ষার সংজ্ঞাকেই বদলে দিয়েছে। তথ্য মুখস্থ করার চেয়ে এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সৃজনশীলতা, দলগত কাজ এবং যোগাযোগের সক্ষমতা। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষকদেরও নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি।

তবে, মূল্যায়ন মানেই যেন শাস্তি বা ভয়ের পরিবেশ তৈরি না হয়। বরং এটি হওয়া উচিত আত্মসমালোচনা ও দক্ষতা বৃদ্ধির একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়া। শিক্ষকের পাঠদান কতটা কার্যকর, তিনি নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন কি না, ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করছেন কি না, কিংবা শ্রেণিকক্ষে শেখার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে পারছেন কি না, সেই বিষয়গুলিও গুরুত্ব পাওয়া উচিত। একই সঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা নবীন শিক্ষকদের পরামর্শ দিলে শিক্ষার পরিবেশ আরও সমৃদ্ধ হবে।

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। একই ভাবে ইউনেস্কো-ও বার বার বলেছে,শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করতে হলে শিক্ষকদের শেখার সুযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। অর্থাৎ, ভাল শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শুধু ছাত্রছাত্রীদের নয়, শিক্ষকদেরও আজীবন শিক্ষার্থী হয়ে থাকার পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

আমরা ছাত্রদের বছরে একাধিক বার মূল্যায়ন করি, কিন্তু যাঁরা সেই মূল্যায়নের ভিত্তি তৈরি করেন, তাঁদের পেশাগত বিকাশকে একই গুরুত্ব দিই না। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। এক জন দক্ষ, কৌতূহলী ও অনুপ্রাণিত শিক্ষক অসংখ্য শিক্ষার্থীর জীবন বদলে দিতে পারেন। তাই শিক্ষকদের মূল্যায়নকে নিয়ন্ত্রণের উপায় নয়, তাঁদের আরও সমৃদ্ধ করে তোলার একটি সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে। কারণ এক জন শিক্ষক যত উন্নত হবেন, ততই উন্নত হবে তাঁর শ্রেণিকক্ষ, আর সেই শ্রেণিকক্ষ থেকেই গড়ে উঠবে আগামী দিনের দক্ষ, মানবিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক।

সম্পাদক সমীপেষু: রুটিরুজির লড়াই

কিন্তু আমরা কি এক বারও ভেবে দেখেছি, ওই মানুষগুলির জীবনে এই উচ্ছেদের অভিঘাত কতটা গভীর? প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে তিন ফুট বাই চার বা পাঁচ ফুটের ছোট ছোট কাঠ ও টিনের গুমটিতে বসেই তাঁরা সংসার চালিয়ে এসেছেন।

সোমা মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ‘কিছুই কি নেই বাকি’ (১৩-৬) অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং মর্মস্পর্শী। এই প্রসঙ্গে একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। গত মাসের এক সকালে বাজারে যাওয়ার পথে দেখি, শেওড়াফুলি স্টেশন-সংলগ্ন রাস্তায়, রেলচত্বরের বাইরের অংশে স্টেশনে যাওয়ার পথের পাঁচিলঘেঁষা এলাকায় সারি সারি হকারের অস্থায়ী গুমটি উধাও। আগে অবশ্য উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ৫০-৬০টি দোকান

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

ছিল সেখানে। বহু বছর ধরে সাধারণ মানুষ ওই পথ ব্যবহার করে বাজার, স্টেশন ও খেয়াঘাটে যাতায়াত করেন। বহু দিনই শুনেছি, ব্রিটিশ আমল থেকেই নাকি পাঁচিলের বাইরের ওই অব্যবহৃত অংশ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যউন্মুক্ত ছিল।

কিন্তু আমরা কি এক বারও ভেবে দেখেছি, ওই মানুষগুলির জীবনে এই উচ্ছেদের অভিঘাত কতটা গভীর? প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে তিন ফুট বাই চার বা পাঁচ ফুটের ছোট ছোট কাঠ ও টিনের গুমটিতে বসেই তাঁরা সংসার চালিয়ে এসেছেন। প্রখর রোদ, প্রবল বর্ষা কিংবা কনকনে শীত— সব উপেক্ষা করে তেলেভাজা, রোল, বিরিয়ানি, রুটি-তরকারি, চা-বিস্কুট, পোশাক, প্রসাধন সামগ্রী, ইমিটেশন গয়না-সহ নানা জিনিস বিক্রি করে পরিবার, সন্তানের পড়াশোনা ও বাড়িভাড়ার খরচ জুগিয়েছেন। অন্য দিকে, সাধারণ ক্রেতারাও তুলনামূলক কম দামে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারতেন। উচ্ছেদের দিন তাঁদের হতাশা ও অনিশ্চয়তার আর্তি শুনেছি, সহজে ভোলার নয়।

আমাদের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে এক সঙ্গে সকলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সহজ নয়। তাই এই সঙ্কটের সময়ে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আইন অবশ্যই তার নিজস্ব পথে চলবে, কিন্তু আইন প্রয়োগের পাশাপাশি পুনর্বাসনের বিষয়টিও সমান গুরুত্ব পাওয়া উচিত। যে-হেতু কেন্দ্র ও রাজ্যে একই রাজনৈতিক দলের সরকার রয়েছে, তাই প্রশাসনের কাছে আবেদন, ওই ধরনের অব্যবহৃত জায়গাগুলিতে উপযুক্ত নিয়ম ও মাসিক সামান্য মাসুলের ভিত্তিতে হকারদের পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করা হোক। তাতে আইনও মানা হবে, আবার বহু পরিবারের জীবিকা ও ভবিষ্যৎও রক্ষা পাবে।

সম্পাদক সমীপেষু: নিরাপত্তার অভাব

আসলে আমরা এমন একটা রাজ্যে বাস করি যেখানে কারও উপর ভরসা করতে ভয় পাই। নেতা, মন্ত্রী বা যে কেউ যত সুরক্ষার আশ্বাসই দিন না কেন, নিজের খেয়াল নিজেকেই রাখতে হয়।

অরিতা ধারা ভট্টের লেখা ‘কথার দাম রাখবে কে’ (১৮-৭) শীর্ষক প্রবন্ধটি অভিভাবকের মনে প্রশ্ন জাগায়— সরকার এই গুরুদায়িত্ব কতটা পালন করতে পারবে। মনে পড়ে, এক বার চেন্নাই থেকে ফিরছিলাম একা। ফ্লাইট দেরি করে ছাড়ায় কলকাতা এয়ারপোর্ট-এ সেটি ল্যান্ড করে মধ্যরাতে। রাতের বেলায় একা ট্যাক্সি ড্রাইভারের উপর ভরসা করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। খোঁজ নিয়ে দেখি ট্যাক্সির এক জন মহিলা আমার কাছাকাছি থাকেন। দু’জনে কেউই কাউকে চিনি না। ওই মহিলা পুরো রাস্তা না জানি কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এলেন, আর আমার ছেলে পুরো রাস্তা আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলল। উনিই প্রথমে নেমে গেলেন, আমিও কিছু পরে বাড়িতে পৌঁছই। ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে নামিয়ে বললেন “ম্যাডাম সব লোক সমান হয় না। অত ভয় পাবেন না।” বোধ হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমরা নিজেদের সুরক্ষার জন্যই কারও সঙ্গে যোগাযোগে ছিলাম।

আসলে আমরা এমন একটা রাজ্যে বাস করি যেখানে কারও উপর ভরসা করতে ভয় পাই। নেতা, মন্ত্রী বা যে কেউ যত সুরক্ষার আশ্বাসই দিন না কেন, নিজের খেয়াল নিজেকেই রাখতে হয়। কিছু দিন আগে বিজেপি সরকারের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ঘোষণা করেছেন “মেয়েরা যা খুশি খাবেন, যা খুশি পরবেন, যেখানে খুশি যাবেন।” এ কথা শুনতে খুবই মধুর, কিন্তু কতটা তার দায়িত্ব নিতে পারবে সরকার? এই আশ্বাসের উপর বিশ্বাস রেখে পুরোপুরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না। কারণ, পরিস্থিতি, স্থান, কাল নির্বিশেষে নিজেরা যদি নিজেদের বুদ্ধি প্রয়োগ না করে চলি, তা হলে বিপদ পিছু ছাড়বে না। কোনও পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত অশান্তির জ্বালা মেটাতেও মহিলাদের উপরেই নির্যাতন নেমে আসে। ঘটনা ঘটার পর পরই অনেক সমবেদনা, অনেক ক্ষতিপূরণ, তদন্ত, মেয়েদের সুরক্ষিত ভবিষ্যতের আশ্বাস পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে পরিস্থিতিকে সামাল দিয়ে মহিলাদের সম্মান বজায় রাখতে সরকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপারগ।

সরকারের কাছে এটুকু দাবি আমরা করতেই পারি, মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার যেন হতে না হয়। শহরের বেশির ভাগ রাস্তাঘাটে আলোর ব্যবস্থা থাকলেও গ্রামের অলিগলি এখনও অন্ধকার এবং শুনশান। পঞ্চায়েত যেন সে দিকে নজর দেয়। গণপরিবহণ, শুনশান রাস্তায় সিসিটিভি-র মাধ্যমে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য ক্যারাটে, জুডো পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সরকারি, বেসরকারি অফিসের নিজস্ব পরিবহণ হলে মহিলারা অনেক বেশি সুরক্ষিত বোধ করবেন। এখনও এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে পুলিশের পৌঁছতে সময় লাগে, সেখানে সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে মেয়েদের সুরক্ষায়। সরকার এবং সাধারণ মানুষ যদি এক সঙ্গে কাজ করে, তা হলে আমরা ভারতীয় নারীরা সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারব।

সম্পাদক সমীপেষু: এখনও অপ্রস্তুত

প্রশ্ন জাগে, এই ধরনের বিভ্রাট কি আগামী দিনের অশনিসঙ্কেত? আমরা কি তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাজনিত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার জন্য এখনও যথেষ্ট ভাবে তৈরি নই?

গত জুলাই মাসে আমার পুত্র পুণেতে শতবর্ষ পার করা একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগ দেয়। প্রথম মাসের বেতন দেশের অন্যতম বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে নিজের সেভিংস অ্যাকাউন্টে গত ২৮ জুলাই জমা হওয়ার মিনিট কয়েকের মধ্যে অ্যাকাউন্টটি লক হয়ে যায়। তার পর থেকে দুই সপ্তাহ কেটে গেলেও দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এখনও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। ব্যাঙ্কের কসবা শাখা, আঞ্চলিক সদর দফতরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় এই পদক্ষেপটি নাকি নিরাপত্তাজনিত কারণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পটনা সার্ভার থেকে করেছে। অতএব অ্যাকাউন্ট আনলক করতে হলে ‘এনহ্যান্সড ডিউ ডিলিজেন্স’ (ইডিডি) প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পটনা শাখায় আবেদন পাঠাতে হবে।

বোঝা গেল, সেটা যে ঠিক কী ভাবে সম্পন্ন হবে, ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয়। প্রায় প্রত্যেক দিন পুণেতে স্থানীয় ইয়েরওয়াড়া শাখায় গিয়ে পুত্র তাড়া দিলেও কর্মপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক ভাবে উপস্থিত হয়ে খোঁজখবর নিতেই পুণের স্থানীয় শাখার আধিকারিকদের দশ দিন লেগে যায়। তাঁদের রিপোর্ট কলকাতা শাখায় আসার কয়েক দিনের মধ্যে এখানকার আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করার পরেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। কেউই সঠিক ভাবে বলতে পারছেন না, কবে অ্যাকাউন্টের লক খুলবে। সদ্য কলেজ থেকে পাশ করে প্রথম চাকরির প্রথম বেতন পাওয়ার আনন্দ কেন ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে এই রকম ভাবে অধরা থেকে যাবে?

প্রশ্ন জাগে, এই ধরনের বিভ্রাট কি আগামী দিনের অশনিসঙ্কেত? আমরা কি তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাজনিত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার জন্য এখনও যথেষ্ট ভাবে তৈরি নই?

সম্পাদক সমীপেষু: ভেজালের কারবার

সামনেই পুজোর মরসুম। প্রায় প্রতি বছরই পুজোর আগে প্রশাসনের তরফে এমন অভিযান চালানো হয়, যদিও তা এই মাত্রায় নয়। প্রশ্ন হল, পুজোর পরেও এমন অভিযান হয় না কেন?

‘২.৭০ লক্ষ খাদ্য ব্যবসায় নমুনা পরীক্ষা মাত্র ৪৪ হাজারের!’ (৭-৯) শীর্ষক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্র। অতিমারি কালে দেখেছি রোগ লুকিয়ে না রেখে বেশি করে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে সমাজকে দ্রুত করোনামুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সে দিক থেকে বিচার করলে, খাবারের ক্ষেত্রেও নমুনা সংগ্রহ বাড়ানো খুবই জরুরি। যে-হেতু রাজ্যে খাদ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসার সংখ্যা নেহাত কম নয়, তাই এই ক্ষেত্রে ‘৪৪ হাজার’ সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে অপ্রতুল। নমুনার সংখ্যা বাড়ানো গেলে খাবারের মানের বিষয়ে আরও স্পষ্ট ছবি পাওয়া সম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে কলকাতা-সহ জেলার বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তরাঁতে খাদ্যের গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধি খতিয়ে দেখতে শুরু করেন খাদ্য ও স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। পোস্তা থেকে পার্ক স্ট্রিট, বসিরহাট থেকে বাঁকুড়া, বনগাঁ, বাগদা থেকে বহরমপুর— দিকে দিকে বাংলার বিভিন্ন হোটেলে ঢুকে অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ নজরে আসে তাঁদের। অভিযানের তালিকায় ছিল ট্যাংরা থেকে টাকি, সোনারপুর,

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

কামালগাজি, গড়িয়া, ধনেখালি ইত্যাদি। এলাকার মিষ্টি, আইসক্রিমের দোকান থেকে শুরু করে রেস্তরাঁর খাবারের মান ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়েছে। সমুদ্র শহর দিঘা, এমনকি এগরা-র হোটেলগুলির অবস্থাও তথৈবচ। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, বাদুড়িয়ার হোটেল থেকে পচা মাংস উদ্ধার। ২০১৮ সালে ভাগাড়ের মৃত পশুর মাংস উদ্ধারের ঘটনায় উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার নাম প্রথম প্রকাশ্যে আসে। এ বারের ঘটনা ফের উস্কে দিল সেই স্মৃতি।

সামনেই পুজোর মরসুম। প্রায় প্রতি বছরই পুজোর আগে প্রশাসনের তরফে এমন অভিযান চালানো হয়, যদিও তা এই মাত্রায় নয়। প্রশ্ন হল, পুজোর পরেও এমন অভিযান হয় না কেন? পরিস্থিতি যা দেখা গেল তাতে স্পষ্ট, দীর্ঘ দিন নজরদারির অভাবে বিষ খাবার খেয়েছে আমজনতা। একাধিক জায়গায় আরশোলার উপস্থিতি থেকে নিষিদ্ধ রং মিশেছে বিরিয়ানি, পোলাও, নানা ধরনের মিষ্টিতে। ছত্রাক মিলেছে আলু, বেবিকর্ন, কাটা আনাজ ও দইয়ে; রান্নাঘরে পাওয়া গিয়েছে পচা মাছ, মাংস-সহ মেয়াদ উত্তীর্ণ তেলও।

ভেজাল নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁরা খাদ্যে এমন বিষ মিশিয়ে নীরবে ক্ষতি করে চলেছেন সমাজের শত শত মানুষের। এই অপরাধের ভয়াবহতা প্রাথমিক ভাবে ধরা না পড়লেও, দীর্ঘমেয়াদে বিস্তৃত। এই ধরনের অপরাধ জনস্বাস্থ্যকে এক ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এবং শুধুমাত্র বর্তমান গ্রাহকরাই নন, বিবেকবর্জিত ভেজাল ব্যবসায়ীরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্যকেও মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই অপরাধ একমাত্র কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমেই রোখা সম্ভব। এর জন্য রাজ্য জুড়ে খাদ্যের গুণমান নিশ্চিত করতে আরও জোরদার করতে হবে নজরদারি।

মানুষের প্রাণ ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি যেখানে জড়িয়ে আছে, সেখানে প্রশাসনের কঠোর হওয়াই কাম্য।

সম্পাদক সমীপেষু: সুরক্ষার দায়িত্ব

সংবাদে প্রকাশ, ভাই-বোনের মাথায় কোনও হেলমেটই ছিল না। হ্যাঁ, হেলমেট পরলেও যে এ রকম দুর্ঘটনা প্রাণঘাতী হবে না, তা বলা যায় না। তবে, হেলমেট পরলে মাথাটি তো রক্ষা পেতে পারে, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, দুর্ঘটনাগ্রস্তের জীবনও রক্ষা পেতে পারে।

‘উদাসীনতার বলি’ (১৭-৮) শীর্ষক সম্পাদকীয়টির শেষ বাক্য দিয়ে শুরু করলাম আমার এই চিঠি। “শিশুর মাথায় হেলমেট পরানো ফ্যাশন নয়, বিলাসিতাও নয়— এটি তার বেঁচে থাকার অধিকার।” খুবই মূল্যবান কথা। প্রত্যেক মা-বাবার কাছে, পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে বাড়ির শিশুটি পরম আদরের ধন। তবু লিখতে বাধ্য হচ্ছি, শিশুর এই বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়ার পিছনে দায়ী এক শ্রেণির অভিভাবকেরই চরম উদাসীনতা। বি টি রোডের সাম্প্রতিক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা তারই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। লরির ধাক্কায় মোটরবাইক থেকে ছিটকে পড়ে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে চিরতরে জীবনদীপ নিবে গেল দুই স্কুলপড়ুয়া ভাই-বোনের।

সংবাদে প্রকাশ, ভাই-বোনের মাথায় কোনও হেলমেটই ছিল না। হ্যাঁ, হেলমেট পরলেও যে এ রকম দুর্ঘটনা প্রাণঘাতী হবে না, তা বলা যায় না। তবে, হেলমেট পরলে মাথাটি তো রক্ষা পেতে পারে, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, দুর্ঘটনাগ্রস্তের জীবনও রক্ষা পেতে পারে। তাই হেলমেট না পরার ব্যাপারে কোনও অজুহাত দেখিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের হাত থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি উপভোগ করার মধ্যে কোনও বীরত্ব নেই। বরং আছে ভবিষ্যতে নিজে বিপদে পড়ার পথ তৈরি করে রাখা। বড়রা তো বটেই, অনেক অপ্রাপ্তবয়স্কও রাস্তায় যে ভাবে দুরন্ত গতিতে মোটরবাইক চালিয়ে যায়, তা খুবই ভয়ঙ্কর। কারণ শুধু নিজের নয়, বেপরোয়া গতিতে মোটরবাইক চালানোর জন্য তারা পথচারীদের প্রাণ সংশয়েরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বড়দের দায়িত্ব হল, এ ব্যাপারে সচেতন থাকা আর প্রাপ্তবয়স্ক না হলে ছেলেমেয়েদের মোটরবাইক-সহ অন্য কোনও যানবাহন চালাতে না দেওয়া।

মনে রাখতে হবে, দুর্ঘটনা কখনও কে ছোট আর কে বড়, তা বিচার করে ঘটে না। ঘটলে উভয়েই বিপদে পড়ে। কেউ প্রাণে বাঁচে, কেউ বাঁচে না। তাই শুধু বড়রা মাথায় হেলমেট পরলেই হবে না, ছোটদের মাথাতেও তাদের উপযুক্ত মানের, নির্দিষ্ট আকারের হেলমেট পরাতে হবে। এর সঙ্গে আইনের প্রশ্ন যদি ওঠে, তা হলে

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

আসে আইনরক্ষকদের কথাও। আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, না মানলে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করার প্রধান দায়িত্ব অবশ্যই আইনরক্ষকদের। তাঁরা বহু ক্ষেত্রে এই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন না, ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনার দায় কিছুটা তাঁদের উপরেও বর্তায়। তাই, কোনও অজুহাত নয়। নিজেদের তো বটেই, পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষার দায়িত্বও সর্বাগ্রে আমাদেরই। তাই তাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টাটিও আমাদেরই করতে হবে।

সম্পাদক সমীপেষু: অসম মনোভাব

আন্তর্জাতিক অসরকারি সংস্থা যখন বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের সমীক্ষা করে ভারতকে বার বার বিশ্ব তালিকায় ‘পিছিয়ে পড়া’ বা ‘নিম্ন অবস্থান’-এ রয়েছে বলে নিবন্ধিত করে থাকে, ভারত সরকার এটা তাদের ‘পদ্ধতিগত ত্রুটি’ বা ‘অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি’, কখনও ‘ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার প্রচেষ্টা’ বলে প্রমাণ করতে চায়।

সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকার এনজিও তথা অসরকারি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অনেকের লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিত করেছে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই এই নিয়ন্ত্রণ— সরকারের দাবি। এই সম্পর্কিত ‘গাহিতে পারি না গান’ (১২-৮) শীর্ষক স্বাতী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি তাৎপর্যপূর্ণ।

এনজিওগুলি সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে এক প্রকার স্বাধীন পাহারাদার হিসাবে অংশগ্রহণ করলেও সরকারের অভিমত, বিদেশি অর্থে পরিচালিত, এমন সংস্থা প্রায়শই দেশের অভ্যন্তরীণ অগ্রগতি ও কল্যাণমূলক সাফল্যকে তুলে না ধরে, বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি লঙ্ঘন করে অস্বচ্ছ ভাবে দায়িত্বপালন করে। দেশের প্রকৃত উন্নয়ন ও খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পগুলির প্রগতিকে এরা তুলে ধরে না। এই কারণে বিদেশি অর্থ পাওয়া সংগঠনগুলির উপর ক্রমেই সরকারের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অসরকারি সংস্থা যখন বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের সমীক্ষা করে ভারতকে বার বার বিশ্ব তালিকায় ‘পিছিয়ে পড়া’ বা ‘নিম্ন অবস্থান’-এ রয়েছে বলে নিবন্ধিত করে থাকে, ভারত সরকার এটা তাদের ‘পদ্ধতিগত ত্রুটি’ বা ‘অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি’, কখনও ‘ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার প্রচেষ্টা’ বলে প্রমাণ করতে চায়। বিভিন্ন রিপোর্ট এবং সংসদে পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, মোদী সরকারের আমলে বিদেশ থেকে অনুদান দেওয়ার লাইসেন্স বা এফসিআরএ-র নথিভুক্তিকরণ বাতিল করা এনজিও-র সংখ্যা কুড়ি হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। অবশ্য, নিয়ম না মানা ও বার্ষিক রিটার্ন জমা না দেওয়ার অনেক অভিযোগও আছে। তবে সমালোচকদের বক্তব্য, এফসিআরএ কঠোর ভাবে প্রয়োগের ফলে ভারতের মতো বিপুল সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সুরক্ষার প্রশ্নে— বিশেষত ক্ষুধা ও অপুষ্টি, প্রান্তিক মানুষের খাদ্যের অভাব, মানবাধিকার, জনজাতি গোষ্ঠীর অধিকার-সহ জনস্বার্থমূলক বিষয় দেশ জুড়ে মারাত্মক চাপের মুখে পড়েছে। তথ্য বলছে, বৈশ্বিক ক্ষুধা তালিকায় ২০০৬ সাল থেকে ক্রমতালিকায় ভারত প্রতি বছর উন্নতিই করছিল। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে অবনতি ঘটে। ২০১৪ সালে ১২০টি দেশের মধ্যে ভারত ছিল ৫৫তম স্থানে, আর সর্বশেষ (২০২৫) সূচকে ১২৩টি দেশের মধ্যে ভারত ১০২তম, যা দেশের অবস্থানকে গুরুতর বলে চিহ্নিত করে।

এমনও হতে পারে, মোদী সরকারের আমলে এ দেশের এনজিও-রা এমন ভয়ানক পরিস্থিতির শিকার না হলে হয়তো ভারতের এই অবনমন হতে পারত না! এনজিও-দের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ত কঠোর অসম মনোভাব কার্যত দেশের সামগ্রিক জনকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে স্থায়ী ক্ষতির ইঙ্গিতবাহী।

সম্পাদক সমীপেষু: প্রকৃতির বিদ্রোহ

আজ হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে আমরা সেই নির্মম সাহিত্যিক সত্যকেই বাস্তবায়িত হতে দেখছি। সুড়ঙ্গ কেটে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, নদীখাতে হোটেলের পর হোটেল নির্মাণ, আর পর্যটনের নামে নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে রুদ্ধ করা— এ সবই মানুষের সেই অহেতুক প্রযুক্তিগত অহঙ্কারের নিদর্শন।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

পৌলমী দাস চট্টোপাধ্যায়ের ‘মুহূর্তমধ্যে বিপর্যয়’ (২-৯) শীর্ষক প্রবন্ধটি সময়োপযোগী। প্রবন্ধে নেপালের সাম্প্রতিক ধ্বংসলীলা এবং সিকিম ও উত্তরাখণ্ডের পূর্ববর্তী বিপর্যয়ের যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা পাঠককুলকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ‘নদীর বিদ্রোহ’-র কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। গল্পের নায়ক নদেরচাঁদ নদীর উপর মানুষের তৈরি কৃত্রিম সেতু আর বাঁধ দেখে উপলব্ধি করেছিল— “হোক ইট, সুরকি, সিমেন্ট, পাথর, লোহালক্কড়ে গড়া ব্রিজ, যে নদী এমনভাবে খেপিয়া যাইতে পারে তাহাকে বিশ্বাস নাই।” গল্পে উদ্দাম নদী শেষ পর্যন্ত মানুষের নির্মিত সমস্ত কৃত্রিম শৃঙ্খল ও বাঁধন ভেঙে নিজের স্বাভাবিক রূপ ছিনিয়ে নিয়েছিল।

আজ হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে আমরা সেই নির্মম সাহিত্যিক সত্যকেই বাস্তবায়িত হতে দেখছি। সুড়ঙ্গ কেটে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, নদীখাতে হোটেলের পর হোটেল নির্মাণ, আর পর্যটনের নামে নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে রুদ্ধ করা— এ সবই মানুষের সেই অহেতুক প্রযুক্তিগত অহঙ্কারের নিদর্শন। প্রকৃতি যখন সেই শিকল ভাঙতে চায়, তখনই মুহূর্তের মধ্যে গ্রাম-শহর মানচিত্র থেকে মুছে যায়।

নেপাল বা সিকিমের হিমবাহ হ্রদ ভেঙে নেমে আসা ধ্বংসলীলা কেবল পাহাড়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, ভৌগোলিক ধারাবাহিকতায় তার মাসুল গুনতে হয় পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র সমতল ভূমির মানুষকেও। কেবলমাত্র বিপর্যয় ঘটার পর ত্রাণ বিতরণ বা শোক প্রকাশে এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে নেই। নদীকে তার স্বাভাবিক পথ ছেড়ে দেওয়া এবং পাহাড়ে পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কঠোর পরিবেশবান্ধব নীতিমালা প্রয়োগ করা এখন সময়ের দাবি। একই সঙ্গে সীমান্তপার ও রাজ্যগুলির যৌথ উদ্যোগে স্থায়ী পরিবেশ-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।

নদীকে আমরা যতই শাসন করতে চাই না কেন, প্রকৃতির বিদ্রোহকে রোধ করার ক্ষমতা মানুষের তৈরি কোনও প্রযুক্তির নেই— এই ধ্রুপদী শিক্ষা যেন আমাদের আধুনিক নীতি-নির্ধারকদের ভাবনায় জাগ্রত হয়।

সকলের দায়

পৌলমী দাস চট্টোপাধ্যায়ের ‘মুহূর্তমধ্যে বিপর্যয়’ প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কিছু কথা। হিমবাহ হ্রদ ভেঙে বা হড়পা বানে ২০১৩ থেকে পাহাড়ে ধারাবাহিক বিপর্যয়ের এক যুগ অতিক্রান্ত। কেদারনাথ, উত্তরকাশী, চামোলী, সিকিম, নেপাল— নানা নাম প্রতি বছর সংবাদে উঠে আসে ধ্বংসের পরিসংখ্যানে। পরিবেশকর্মীরা বিভিন্ন মাধ্যমে লেখেন, বলেন। প্রতিক্রিয়ায় পাঠক, দর্শক মতামত দেন। প্রশাসনিক ব্যর্থতা, পর্যটন ব্যবসায়ীদের হঠকারিতা, পর্যটককুলের অতি বিলাসিতা, উষ্ণায়ন, উন্নয়ন, হোটেল, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি চক্রে আবর্তিত হয় কারণ অনুসন্ধান। তার পর যে কে সে-ই!

এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু সহজও নয়। উপভোগসর্বস্ব জীবন যাপনে আরামের অভ্যাস ও চাহিদা এখন সর্বত্র। এসি হোটেল ছাড়া থাকা যাবে না। এসইউভি, হেলিকপ্টার নিয়ে পর্বতচূড়ায় পৌঁছে যাচ্ছেন পর্যটক। কোনও ত্যাগ, কষ্ট স্বীকারে ভ্রমণবিলাসীরা রাজি নন। নির্জনতাকে ভেঙে বিলাসবহুল অবৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো পাহাড়ে গড়ে তোলা হচ্ছে উচ্চ মুনাফার স্বার্থে। বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ঢালাও পরিকল্পনাও পাহাড়ে ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনাকেই মসৃণ করতে করা হয়। যদিও চুইয়ে আসা সুবিধায় কিঞ্চিৎ সহজ হয় স্থানীয়দের বেঁচে থাকার পথটি।

কিন্তু ভ্রমণ তো নিছক হইচই আমোদপূর্ণ এক স্থানান্তর যাত্রা নয়। একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে যে কোনও স্থান ভ্রমণের অধিকার কারও চূড়ান্ত হতে পারে না। আমুদে ভ্রমণ সর্বগ্রাসী হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে। পাহাড়ের সংবেদনশীল ক্ষেত্রে ভ্রমণকে আরামদায়ক করা চলবে না। সংবেদী পর্যটক ত্যাগ, তিতিক্ষার পরিচয় দিয়ে কষ্টস্বীকারে পাহাড়কে অনুভব করবেন। কারণ, সব কিছুই দর্শনীয় হয় না, হতে দেওয়া যায় না। এই দায় শুধুমাত্র প্রশাসনিক নয়। অনেকটা ভ্রমণবিলাসীদেরও বটে।

সম্পাদক সমীপেষু: সম্পদ রক্ষায়

প্রশাসনের কাছে আবেদন, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-সহ ঐতিহ্যবাহী শহর ও গ্রামগুলির সাংস্কৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হোক।

ওয়েবসাইট: banglabakaran.com ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

দীপঙ্কর ঘোষের “এই ‘ঐতিহ্য’ রক্ষা করবে কে” (১২-৯) প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বলতে চাই, বাঁকুড়া জেলা অত্যন্ত ঐতিহ্যপূর্ণ ও সংস্কৃতিসমৃদ্ধ। বিশেষত বিষ্ণুপুরের ইতিহাস, স্থাপত্য, সঙ্গীত ও হস্তশিল্প এই জেলার গৌরব। অথচ দীর্ঘদিনের অবহেলায় এই ঐতিহ্য যেন ক্রমশ মলিন হয়ে পড়ছে। মল্ল রাজবংশের ইতিহাস, পোড়ামাটির মন্দির, রাসমঞ্চ, মদনমোহন মন্দির, জোড়বাংলা মন্দির— সবই বিষ্ণুপুরের অমূল্য সম্পদ। দলমাদল কামানও এই ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত মন্দিরগুলির টেরাকোটা ফলকে পুরাণ, মহাকাব্য, ধর্মীয় আখ্যানের পাশাপাশি সমকালীন জনজীবনের নানা ছবি ফুটে উঠেছে। বিষ্ণুপুরের বালুচরি শাড়িতেও সেই ঐতিহ্য ও নকশার প্রভাব দেখা যায়। পাশাপাশি বিষ্ণুপুর ঘরানার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরও রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতরও বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির, বালুচরি, সঙ্গীত ও হস্তশিল্পের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছে।

ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক পর্যটনের উপযোগী করে তুলতে আরও পরিকল্পিত উদ্যোগ প্রয়োজন। শুধু মন্দির সংরক্ষণ করলেই হবে না, পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধা, পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল, শৌচাগার, থাকার ব্যবস্থা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উপযুক্ত পর্যটন-পরিকাঠামোও গড়ে তুলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতরের তথ্য অনুযায়ী বিষ্ণুপুর কলকাতার সঙ্গে সড়ক ও রেলপথে যুক্ত এবং সেখানে পর্যটন-পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে; কিন্তু ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আরও উন্নত ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা করার অবকাশ অবশ্যই রয়েছে।

সর্বোপরি, প্রশাসনের কাছে আবেদন, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-সহ ঐতিহ্যবাহী শহর ও গ্রামগুলির সাংস্কৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হোক। শুধু নামমাত্র সংস্কার নয়, পুরনো স্থাপত্যের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে বিশেষজ্ঞের পরামর্শে সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন। একই সঙ্গে এই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় কারিগর, তাঁতি, শিল্পী ও অন্যান্য মানুষের জীবিকাকেও সংরক্ষণ-পরিকল্পনার অংশ করা দরকার। ঐতিহ্য বাঁচলে তাঁদের দক্ষতাও বাঁচবে, তাঁদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে।

সম্পাদক সমীপেষু: জরুরি পূর্বশর্ত

ভারত স্বাধীন হয়েছে প্রায় আশি বছর আগে। তবু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এখনও নানা বিশেষ প্রকল্প ও সহায়তার প্রয়োজন হচ্ছে। কারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান কিংবা আর্থিক নিরাপত্তা— কোনও ক্ষেত্রেই সারা দেশে সমান পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

অমিতাভ গুপ্তের ‘সুযোগ নয়, সক্ষমতার সাম্য’ (৩০-৯) প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা। প্রবন্ধে সুযোগের সমতা এবং সেই সুযোগ গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতির মধ্যে যে পার্থক্যটি তুলে ধরা হয়েছে, তা যথার্থ। নদীর সঙ্গে বনের তুলনা চলে না, গায়কের সঙ্গে নৃত্যশিল্পীরও নয়। মানুষের যোগ্যতা বিচার করতে হলে তার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থানকেও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। রোগাক্রান্ত একটি ছেলের সঙ্গে পালোয়ান ছেলেকে লড়িয়ে দিয়ে কে যোগ্য, কে অযোগ্য, তার বিচার করা কি সম্ভব? এই সহজ সত্যটি আমাদের নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার। দেশে সংরক্ষণ থাকবে কি না, তা নিয়ে বিতর্কের সময়ও দেখতে হবে, দীর্ঘ দিনের বৈষম্যের ফলে যাঁরা পিছিয়ে রয়েছেন, তাঁদের সমপর্যায়ের প্রস্তুতি ও সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না। নইলে কাগজে-কলমে সমান সুযোগ থাকলেও বাস্তবে তার সুফল সবার কাছে সমান ভাবে পৌঁছবে না।

ভারত স্বাধীন হয়েছে প্রায় আশি বছর আগে। তবু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এখনও নানা বিশেষ প্রকল্প ও সহায়তার প্রয়োজন হচ্ছে। কারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান কিংবা আর্থিক নিরাপত্তা— কোনও ক্ষেত্রেই সারা দেশে সমান পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এমন অবস্থায় শুধু প্রতিযোগিতার ময়দানটি সবার জন্য খুলে দিলেই কি সমান ফল পাওয়া সম্ভব? গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে শুধু আগায় জল ঢাললে যেমন গাছ বাঁচে না, তেমনই শৈশব থেকেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপদ পরিবেশের ঘাটতি থেকে গেলে পরবর্তী জীবনে একই সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পিছিয়ে থাকা মানুষকে অনেক দূর থেকে দৌড় শুরু করতে হয়। তাই সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার দাবি কতখানি যুক্তিযুক্ত, তা ভাবার আগে রাষ্ট্রের দায়িত্বটি কোথায় শেষ হচ্ছে, সেই প্রশ্নও করা

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

দরকার। শুধু আসন বা সুযোগের ব্যবস্থা নয়, প্রত্যেক শিশুকে এমন ভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা প্রয়োজন, যাতে পরবর্তী জীবনের প্রতিযোগিতায় সে নিজের সামর্থ্যেই লড়াই করতে পারে।

পাশাপাশি এও সত্যি যে, পিতা-মাতার অতিরিক্ত প্রত্যাশা, নম্বরের জন্য ক্রমাগত চাপ এবং প্রতিযোগিতার বোঝা অনেক ছাত্রছাত্রীর কাছে শিক্ষাকে আনন্দের বদলে ভার করে তুলছে। ফলে বই ও শিক্ষার প্রতি অনীহাও বাড়ছে। শিক্ষাকে জীবনের বাহন করে তোলার বদলে আমরা যেন তাকে কেবল বহন করেই চলেছি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার আলোকে এই প্রবণতাটিকেও নতুন করে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি, দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাসকে অস্বীকার না করে সকলকে যতটা সম্ভব সমকক্ষ অবস্থানে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টাই হওয়া উচিত শিক্ষানীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সম্পাদক সমীপেষু: কন্যাই সম্পদ

অনেক দরিদ্র পরিবার মনে করে, মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলে মেয়ে ভাল, নিরাপদ থাকবে। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অভিভাবকেরা বুঝতে পারেন না যে অল্প বয়সে বিয়ে মেয়ের জীবনকে কতটা বিপন্ন করে। ‘বেশি বয়স হলে ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না’— এই ভুল ধারণা এখনও অনেক পরিবারে বদ্ধমূল।

বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের এক গভীর ক্ষত। আইন করে ১৮ বছরের নীচে মেয়ের এবং ২১ বছরের নীচে ছেলের বিয়ে নিষিদ্ধ করা হলেও, বাস্তবে গ্রাম থেকে শহর— সর্বত্রই এই প্রথা আজও রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, বিহার, ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যে এর হার এখনও উদ্বেগজনক। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহ এবং নাবালিকার সন্তান প্রসব নিয়ে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। আমাদের মনে রাখা দরকার, শুধু আইন প্রয়োগ করে এই সামাজিক সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সমাজে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ শুধু আইনি দায়িত্ব নয়, এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বও। অনেক দরিদ্র পরিবার মনে করে, মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলে মেয়ে ভাল, নিরাপদ থাকবে। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অভিভাবকেরা বুঝতে পারেন না যে অল্প বয়সে বিয়ে মেয়ের জীবনকে কতটা বিপন্ন করে। ‘বেশি বয়স হলে ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না’— এই ভুল ধারণা এখনও অনেক পরিবারে বদ্ধমূল। করোনা-পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ দিন স্কুল বন্ধ থাকায় এবং শিক্ষাজীবনে ছেদ পড়ার ফলে কিছু ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের ঝুঁকি বেড়েছে। বাল্যবিবাহ একটি মেয়ের জীবনকে নানা দিক থেকে বিপন্ন করে। অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে মা ও শিশুর নানা স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে। অপুষ্টি, রক্তাল্পতা-সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসমস্যাও দেখা দিতে পারে। বিয়ের পরে অনেক সময়ই স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। একটি সম্ভাবনাময় জীবন অন্ধকারে হারিয়ে যায়। সে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার সুযোগও হারায়।

ছোট মেয়েটি শ্বশুরবাড়ির দায়িত্ব নেওয়ার মতো মানসিক ও শারীরিক ভাবে প্রস্তুত থাকে না, ফলে তাকে নানা ধরনের নির্যাতন সহ্য করতে হতে পারে। অল্প বয়সে মাতৃত্বও তার জীবনে শারীরিক ও মানসিক নানা জটিলতা তৈরি করে। যখন দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা, অর্থাৎ নারীদের একটি বড় অংশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত থাকে, তখন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কখনওই সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী প্রকল্পের মতো উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। পঞ্চায়েত, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিয়মিত সচেতনতা শিবির করতে হবে। বাল্যবিবাহ যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তা বোঝাতে হবে। কোথাও বাল্যবিবাহের খবর পেলে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮-এ জানাতে হবে। প্রশাসনকেও দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়েকে বোঝা নয়, সম্পদ হিসাবে দেখতে শেখাতে হবে। তাকে কারিগরি শিক্ষা, খেলাধুলো এবং নিজের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ দিতে হবে।

একটি ১৪-১৫ বছরের মেয়ের হাতে বই থাকা উচিত, কোলে সন্তান নয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ মানে শুধু একটি মেয়েকে বাঁচানো নয়, একটি পরিবার, একটি সমাজ এবং একটি প্রজন্মকে বাঁচানো। আসুন, আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করি— ‘আমাদের গ্রামে, আমাদের পাড়ায় কোনও বাল্যবিবাহ হতে দেব না।’ একটি সুস্থ, শিক্ষিত ও উন্নত সমাজ গড়তে হলে বাল্যবিবাহকে ‘না’ বলতেই হবে।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

সম্পাদক সমীপেষু: বিপন্ন আমোদর

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই বদল আমাদের ভাবায়। উন্নয়ন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে জলসম্পদের উপর মানুষের চাপও বেড়েছে।

সুপ্রতিম কর্মকারের ‘বৃষ্টি ধরার উপায়’ (৫-৯)-এর পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি। খুবই ছোট্ট একটি নদী, নাম তার আমোদর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসেও এই নদীর উল্লেখ আছে। জয়রামবাটীর পাশ দিয়েও বয়ে চলেছে এই ছোট্ট নদী। স্থানীয় মানুষের জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কও দীর্ঘ দিনের। শৈশবে বহু মানুষের কাছে আমোদরের পাড় ছিল সাঁতার শেখা ও সাঁতার কাটার জায়গা। তার তীরে আজও নানা লোকাচার ও উৎসবের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

কিন্তু সেই আমোদরের চেহারা বদলে গিয়েছে। যে নদীর দুই তীরে মাটির নীচের স্তর থেকে বছরভর ঝরনার জল বেরিয়ে আসত, সেই ঝরনা আজ আর দেখা যায় না। বিশ-ত্রিশ বছর আগেও নদীর বুকে বালি সরিয়ে পল্লির সাঁওতাল মহিলাদের মাটির কলসিতে পানীয় জল সংগ্রহ করতে দেখা যেত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নদীর জলধারাকে মাটির বাঁধ দিয়ে কোথাও কোথাও আটকে রাখার ব্যবস্থাও ছিল। এখন সেই স্মৃতি ফিকে হয়ে আসছে। নদীও বছরের একটা বড় সময় প্রায় শুকিয়ে থাকে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই বদল আমাদের ভাবায়। উন্নয়ন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে জলসম্পদের উপর মানুষের চাপও বেড়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার, জলধারণের স্বাভাবিক ব্যবস্থা নষ্ট হওয়া এবং নদীর প্রতি অবহেলা— সব মিলিয়ে ছোট নদীগুলির অস্তিত্ব আজ প্রশ্নের মুখে। আমোদর শুধু একটি ছোট নদী নয়, বহু মানুষের শৈশব, জীবনযাপন ও স্মৃতির অংশ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে নদী সম্মান পেয়েছিল, সেই নদী যদি আমাদের চোখের সামনে ক্রমশ শুকিয়ে যায়, তবে প্রশ্ন উঠবেই— বিজ্ঞান ও উন্নয়ন কি মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্রকৃতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারছে? ছোট্ট আমোদরকে বাঁচানো তাই আমাদের জলসম্পদ ও পরিবেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখার সঙ্গেও যুক্ত।

প্রশ্নের অধিকার

‘পাঁচ বছরের চুক্তি-নিয়োগ’ (১১-৯) শীর্ষক শৈবাল কর লিখিত প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা। বহু ক্ষেত্রেই যে-হেতু আমাদের দেশে ভোটপ্রার্থী নির্বাচিত হন ‘পাবলিক ফিগার’ হিসাবে জনপ্রিয়তার নিরিখে, তাই তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতা সম্পর্কে জনগণ ভোটদানের পূর্বে অজ্ঞ থাকেন। আর এ ভাবেই অনেক মানুষ পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় উচ্চ মানের হন না। সে ক্ষেত্রে দেশের মানুষ সংসদ কিংবা বিধানসভায় নীতি নির্ধারণের ভার ওই অযোগ্য মানুষটির হাতেই তুলে দেন। আবার একক ভাবে কোনও ব্যক্তির দক্ষতার উপর রাজনৈতিক দলগুলি নির্ভর করলে অনেক সময় ভবিষ্যতে তার ফল ভুগতে হয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান সময়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বেতন-ভাতা’সহ দুর্নীতির মাধ্যমে বিবিধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের পথ সুগম থাকায় আজকের রাজনৈতিক জগৎ অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় পেশা হয়ে উঠেছে। এক সময় রাজনীতিতে আদর্শবান কিছু মানুষের বিচরণ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে তা যেন সোনার পাথরবাটিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

আবার প্রতিটি মূল্যবান ভোট যে যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঠিক জায়গাতেই যায়, তা হয়তো নয়। কারণ আমরা সাধারণ মানুষও সর্বদা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের জীবনে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি না। যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণ আমাদের জীবনে সব সময় প্রভাব বিস্তার করে না। আর তাই এ দেশে এখনও ভোটারদের ভয় দেখিয়ে কিংবা লোভ দেখিয়ে ভোটের বাক্স ভরা যায়।

বুদ্ধিমান রাজনীতিকদের কাছে জনতুষ্টিবাদ নির্বাচনে জয় হাসিল করার অন্যতম হাতিয়ার। আর এ ক্ষেত্রে ভোটারদের আবেগকে স্পর্শ করাই রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। নিজেদের পক্ষে ভোট টানার লক্ষ্যে দেশের উন্নয়নের জটিল সমীকরণগুলি অনেক সময়ই রাজনৈতিক নেতারা ভুল তথ্যের মাধ্যমে তুলে ধরে জনসাধারণকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেন। সে ক্ষেত্রে আমজনতা ওই সমস্ত জটিল-কুটিল সমীকরণ নিয়ে

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

অত্যধিক গভীরে বিশ্লেষণ করেন না, কিংবা ভাবেনও না। ব্যক্তি আমি এবং পরিবার যদি রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিঞ্চিৎ সুবিধা পেয়ে থাকে, তা নিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন। দেশের রাজস্ব থেকে বেতন এবং ভাতা পাওয়া রাজনীতিকদের মুখের উপর প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়ায় জনসাধারণের খামতি থেকে যায়। তবে বর্তমান সময়ে উচ্চশিক্ষিত এবং রাষ্ট্রের নিয়মকানুনকে বুঝতে সচেষ্ট জেন-জ়ি, আলফা-দের দল সমস্বরে দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে দেশের রাজনীতিকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে চলেছেন। যন্তর মন্তরের আন্দোলনই তার হাতে গরম প্রমাণ।

মজবুত 'নাগরিক সমাজ' সুস্থ গণতন্ত্রের জন্ম দেয়। রাজনীতিবিদদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রে নির্বাচকদের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচকদের বিচারক্ষমতার জোরে যে সকল রাজনীতিক ক্ষমতা ও সুবিধা ভোগ করছেন, তাঁরা যে কাজের জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন, তার হিসাব চাওয়ার অধিকার অবশ্যই জনতা-জনার্দনের আছে। কিন্তু সেই আমজনতাকেও যে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। তবেই রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতায় বসানো এবং প্রয়োজনে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে দেশের জনতা সদর্থক অর্থেই যুক্তিপূর্ণ বিচারে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠতে পারবেন। এর জন্য সকলকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হতে হবে না। খানিক বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে চোখ-কান খোলা রাখলেই চলবে।

নিরাপত্তার অজুহাত

এই জয়ের এক দিকে যদি থাকে কর্মক্ষেত্র নির্বিশেষে নারী-পুরুষ উভয়েরই যোগদানে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, তবে অন্য দিকে অবশ্যই, নিরাপত্তার অজুহাতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের যোগদানে বাধার দীর্ঘকালীন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ দান।

সাম্যের মৌলিক অধিকারটিকে লঙ্ঘন করছে— এই মর্মে 'কেরালা আবগারি শপস ডিসপোজ়াল রুলস, ২০০২'-এর একটি ধারাকে সম্প্রতি বাতিল করেছে কেরল হাই কোর্ট। এই রায় কেরলে নারীর কর্মসংস্থানের প্রশ্নে এক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশিকা। কারণ, আইনের এই ধারা অনুযায়ী, মহিলাদের তাড়ির দোকানে কাজ পাওয়া এত দিন নিষিদ্ধ ছিল। এর বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ত্রিশূরের এক মহিলা, যিনি সদ্যমৃত স্বামীর কর্মক্ষেত্র, এক তাড়ির দোকানে কাজে যোগ দিতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন এই আইনের কারণেই। কিন্তু সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি, বরং কাজে যোগদানের অধিকারের লড়াইটিকে আদালত অবধি টেনে নিয়ে গিয়েছেন। দীর্ঘ লড়াইয়ে জয় এসেছে। সম্প্রতি সেই দোকানেই কাজে যোগ দিয়েছেন তিনি।

এই জয়ের এক দিকে যদি থাকে কর্মক্ষেত্র নির্বিশেষে নারী-পুরুষ উভয়েরই যোগদানে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, তবে অন্য দিকে অবশ্যই, নিরাপত্তার অজুহাতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের যোগদানে বাধার দীর্ঘকালীন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ দান। আইনের সপক্ষে রাষ্ট্রের যুক্তি ছিল— কর্মক্ষেত্রে শোষণ এবং হেনস্থার হাত থেকে নারীর নিরাপত্তা বিধান। এর কারণটিও মামলা চলাকালীন আলোচনায় উঠে এসেছে। তাড়ির দোকানগুলি সাধারণত প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠে। তদুপরি, খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র হিসাবে এগুলি প্রায়শই গোলমালের আখড়ায় পরিণত হয়। একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে রাষ্ট্র দাবি তোলে, বিশেষ কিছু পেশার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে নারী ও পুরুষকে একই গোত্রে ফেলা চলে না। এই সব দাবিই নস্যাৎ করেছে কেরলের উচ্চ আদালত। বরং, ২০০৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়কে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের কাজ করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারির পরিবর্তে রাষ্ট্র বরং কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করতে এবং মেয়েদের সুরক্ষিত পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হোক। রাষ্ট্রের দায়িত্ব কর্মক্ষেত্রের পরিবেশকে এমন ভাবে তৈরি করা, যাতে স্বাধীন ভাবে পছন্দের পেশায় যোগ দিতে মেয়েরা উৎসাহ পায়।

প্রসঙ্গত, ভারতে এখনও বিভিন্ন পেশায় মেয়েদের যোগদান আইনগত ভাবে নিষিদ্ধ। বেশ কিছু রাজ্যে এখনও কারখানায় রাতের শিফটে মেয়েদের কাজ করার অনুমতি নেই। অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ ক্রমশ এই আইনি বাধা সরানোর পথে হাঁটলেও অন্য রাজ্যে তা ঘটেনি। 'বিপজ্জনক' হিসাবে চিহ্নিত বেশ কিছু শিল্পক্ষেত্রে মেয়েদের কাজে নেওয়া হয় না। দেখা গিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা মেয়েদের উচ্চ মজুরি থেকেও বঞ্চিত করছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০২৫ সালের আগে অবধি মদ বিক্রি ও পরিবেশনের কাজে মেয়েদের বাদ রাখা হয়েছিল।

🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

ভারতের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের নিরিখে মেয়েরা এখনও অনেক পিছিয়ে। পারিবারিক বাধাই সেখানে মুখ্য। তদুপরি, রাষ্ট্র স্বয়ং যদি নিরাপত্তার অজুহাতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে রাখে, তবে তা দেশের উন্নতির পথে বিষম বাধাস্বরূপ। কেন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্র মেয়েদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারছে না, উত্তর খোঁজা জরুরি। মূল কথা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার চেয়ে মেয়েদের আটকে দেওয়া সব সময়েই সহজতর। সেই সহজ ও বিপজ্জনক পথটাকেই আটকানো দরকার।